

সুষ্ঠ জ্ঞান, মানব স্বভাব ও মৌলিক শিক্ষার মানদণ্ডে হিন্দুধর্ম

প্রশ্ন উত্তরের আলোকে।

ড. হাইছাম ত্বালা'আত



Rwwad Translation Center




Rabwah Association



IslamHouse Website

This book is properly revised and designed by Islamic Guidance & Community Awareness Association in Rabwah, so permission is granted for it to be stored, transmitted, and published in any print, electronic, or other format - as long as Islamic Guidance Community Awareness Association in Rabwah is clearly mentioned on all editions, no changes are made without the express permission of it, and obligation of maintained in high level of quality.

 Telephone: +966114454900

 Fax: +966114970126

 P.O.BOX: 29465

 RIYADH: 11557

 ceo@rabwah.sa

 www.islamhouse.com

আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।
সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু
'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ
এবং তাঁর অনুসারীদের উপর। অতঃপর:

হিন্দুধর্ম কখনো কখনো ধর্ম হলেও কিন্তু অতি সূক্ষ্ম
দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মূলত একটি পার্থিব পদ্ধতি।

বিশ্বে জনসংখ্যার আলোকে হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের
সংখ্যা প্রায় ১৫%। পৃথিবীতে এর অনুসারীর সংখ্যা একশ
বিশ কোটিরও বেশি।

যুগের পরিক্রমায় হিন্দুধর্ম বিক্রিত প্রায়।

বৈদিক যুগের পর থেকে হিন্দুধর্ম যৌক্তিক, জ্ঞানগত ও
স্বভাবজাত প্রকৃতির দিক থেকে অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন।
এ বইয়ে আমরা সেগুলোর কয়েকটি তুলে ধরব।

হ্যাঁ!

হিন্দুধর্ম বেদের মৌলিক শিক্ষাসমূহ (যা হিন্দুধর্মের
মৌলিক উৎসসমূহের অন্যতম) থেকে অনেক দূরে সরে
গেছে। বরং তারা বিভিন্ন মানুষ, সন্ন্যাসী ও ভগবত গীতার
শিক্ষার অনুসরণ করছে।

Bhagavad Gita भगवद्गीता গোপনীয় তন্ত্র Tantras

সুতরাং ছোট এ পুস্তিকাতে আমি যুক্তি, আধুনিক জ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ও হিন্দুদের হাতে এ সময় পর্যন্ত বর্তমান থাকা বেদের মৌলিক শিক্ষার আলোকে বর্তমানে হিন্দুধর্মের অবস্থা নির্ণয় করার চেষ্টা করব। আর আমি এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী যে, এখন পর্যন্ত বেদে অবশিষ্ট থাকা সত্য এবং হিন্দুদের স্বভাবজাত প্রকৃতির মধ্যে যা রয়েছে, তা হিন্দুদেরকে নিরাপদে প্রকৃত সত্য দীন ইসলামে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

বেদ হচ্ছে: সার্বিকভাবে হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্রতম গ্রন্থ।

স্বভাবজাত প্রকৃতি হচ্ছে: মানুষের অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্য ও তার পরিণতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে উদ্ভুদ্ধকারী শক্তি। এ উদ্ভুদ্ধকারী শক্তির মনোযোগ হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং শরী'আতসম্মত উপায়ে আল্লাহর দাসত্ব করা।

সত্য দীন হল, সেই বার্তা যা অন্তর্ভুক্ত করে বেদের মধ্যে থাকা অবশিষ্ট হককে (সত্য)। আর তা হলো, প্রকৃতির আহ্বান। আর সেটা জগতবাসীদের জন্য আল্লাহর অহী এবং উপনিষদে (Upanishad উপনিষদ) থাকা শিক্ষার আলোকে আল্লাহর তাওহীদের নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে সুস্পষ্ট বার্তা।

এ ছোট পুস্তিকাতে আমি বৈদিক যুগের হিন্দুধর্ম ও বর্তমান যুগের হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

মনে রাখতে হবে হিন্দুধর্মে অসংখ্য পরিবর্তন ঘটেছে...

বেদে বর্ণিত সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার তাওহীদের শিক্ষার অবশিষ্টাংশ থেকে হিন্দুধর্ম বহুদূরে সরে গেছে। ফলে বর্তমান হিন্দুধর্মে ওয়াহদাতুল উযূদ (সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার একীভূত হওয়া) এর বিশ্বাস তুমি হিন্দু ধর্মে দেখতে পাবে। যেখানে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টবস্তুর সাথে একাকার হয়ে গেছে। ফলে সৃষ্টবস্তুই হুবহু সৃষ্টিকর্তা। এ অভিনব বিশ্বাস শুধু সুস্পষ্ট বৈদিক শিক্ষারই পরিপন্থী নয়; বরং এটি বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী। কারণ, এটি কিভাবে সম্ভব যে, ইলাহ প্রতিটি বস্তুর মধ্যে বিস্তৃত। তারপর হে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী, তুমি তাঁর কাছে পৌঁছার বিভিন্ন ধরণের যোগ-সাধনা ও আরাধনার মাধ্যমে চেষ্টা কর; অথচ তিনি তোমার মধ্যেই রয়েছেন?

এটা কী একটি স্পষ্ট যুক্তিক প্রশ্ন নয়?

ওয়াহদাতুল উযূদ (সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার একীভূত হওয়া) এর বিশ্বাস, বাস্তবতার নিরেখে এ কথার প্রতি আহ্বান করে যে, । প্রতিটি ধর্ম যাতে মূর্তি অথবা পাথরের পূজা করা হয়, সেটি শেষ পর্যন্ত ইলাহেরই ইবাদত। কেননা এ বিশ্বাস অনুযায়ী মূর্তি অথবা পাথর হচ্ছে ইলাহ। ধারণা মতে ইলাহ

প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই রয়েছেন, আর তিনিই [স্বয়ং] সকল বস্তু।

এ বাস্তবতার নিরিখে এটি লক্ষ্য ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেয়, যা আমি এ পুস্তিকাতে স্পষ্ট করব।

ইতোপূর্বে যা বলা হয়েছে তার সাথে আমি আরও একটি বিষয় যোগ করব, তা হচ্ছে: বেদ সুস্পষ্টভাবে সে ইলাহের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দেয়, যে ইলাহ মাখলুক থেকে আলাদা। এসব সৃষ্টবস্তু হচ্ছে আল্লাহর মাখলুকাত। আর আল্লাহর মাখলুকাতের (সৃষ্টিবস্তুর) এ ক্ষমতা কখনোই নেই যে, সেগুলো আল্লাহকে ধারণ করবে, যাতে তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেন।

বেদ বলে, বিশেষত ঋগবেদ (ঋগ্বেদ) বলে: “হে আল্লাহ (ভগবান)! সূর্য ও বিশ্ব তাদের উভয়েরই এ ক্ষমতা নেই যে, তারা আপনাকে আয়ত্ব করবে এবং আপনাকে ধারণ করবে।” [১]

সুতরাং ওয়াহদাতুল উযূদ (সৃষ্টির সাথে স্রষ্টা একাকার হওয়া) এর বিশ্বাসটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে বেদ থেকে এটি একটি সুস্পষ্ট দলিল। সুতরাং আল্লাহ তা’আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

বর্তমান হিন্দুধর্মে তুমি আত্মার স্থানান্তরের (الأرواح تناسخ) বা পুনর্জন্মের বিশ্বাস দেখতে পাবে, যেখানে মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে অন্য নতুন কোন জীবিত প্রাণীর মধ্যে নতুন করে জন্ম নেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রাণীসমূহের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং প্রাণ রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষ [আত্মা] তার পূর্বে আসা অন্য কোন জীবিত প্রাণীর মধ্যে ছিল, এরকম। এ বিশ্বাস অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। যদি আত্মার স্থানান্তর বা পুনর্জন্মের বিশ্বাস সঠিকই হয়ে থাকে, তবে দুগ্ধপোষ্য শিশুরা কেন প্রাপ্ত বয়স্কদের ন্যায় জ্ঞানগত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না? [২]

তারপর, এ আত্মার স্থানান্তর বা পুনর্জন্মের বিশ্বাস যা বারংবার জন্মের ধারাবাহিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি কিভাবে হতে পারে, যখন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে এটি সাব্যস্ত, জীবনের শুরু আছে, পৃথিবীর নিজেস্বরূপ শুরু আছে, পৃথিবী আদি নয়।

তারপরও যদি পুনর্জন্মের ধারণা সঠিক হয়, তাহলে জরুরি হলো, বিশ্বজগতের সৃষ্টজীবের সংখ্যা নির্দিষ্ট; কেননা তাদের কতক কতকের মধ্যে স্থানান্তরিত। অথচ আজ পর্যন্ত এ কথা কেউ বলেনি!

এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বেদ পুনর্জন্মের কথা বলেনি। এমনকি হিন্দু পণ্ডিত শ্রী সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার

বলেছেন: “পুনর্জন্মের বিশ্বাস বেদসমূহে নেই। যারা আছে বলে দাবী করে, আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি।” [৩]

বিদ্যালঙ্কারের কথা সত্য হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে, হিন্দুরা একটি প্রাচীন ধর্মীয় আচার পালন করে যাকে বলা হয়: শ্রাদ্ধ (Śrāddha শ্রাদ্ধ), এবং এই আচারের উদ্দেশ্য হল: মৃতদের আত্মাকে শান্ত করা।

তাহলে কিভাবে আত্মার পুনর্জন্ম হয়; অথচ তারা মৃতদের আত্মাকে শান্ত করে দেয়?

হিন্দুধর্মের বর্তমান আর একটি বিশ্বাস হল: ‘কর্মফল’। যেহেতু মানুষ তাদের পূর্বের কর্মের ফলস্বরূপ কর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করে, তাই যে ব্যক্তি ভ্রষ্ট, সে অন্য একটি নতুন জীবনে নিম্ন শ্রেণীতে বা বৃহত্তর দুর্দশার মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে।

এর উপরে ভিত্তি করে, হিন্দুরা আক্রান্ত ব্যক্তিকে মনে করে যে, তার আক্রান্ত হওয়া অতীতের গুনাহসমূহের পরিণতি। এ বিকৃত ও অমূলক চিন্তা গোটা জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। আর সে মানবতার কোন কাজেই আসেনা; বরং সে এটি স্বীকৃতি দেয় যে, মানুষের উপরে আসা বিপদ হচ্ছে তার পূর্বের জীবনে করা পাপের প্রাকৃতিক শাস্তি। নিশ্চয় এটি এক ধরণের পশ্চাদপসরণ, জুলুম (নির্যাতন) ও শ্রেণি বৈষম্যের মিলন।

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে: এ 'কর্মফল' নামক বিশ্বাসটি বেদের কোথায় রয়েছে?

বেদসমূহ স্পষ্ট করেছে যে, অবশ্যই জান্নাত (স্বর্গ) ও জাহান্নাম (নরক) রয়েছে, যা আল্লাহ মানুষের আমল অনুসারে প্রদান করবেন, আর অন্য কোন জীবের মধ্যে নতুন জন্ম নেওয়া বলে কিছু নেই।

ঋগবেদ বলেছে: "আমাকে এমন স্থানে স্থায়ী করে দিন, যেখানে সব ধরনের উপভোগ্য বস্তু ও আনন্দ বন্টন করা হয়, আর যেখানে আত্মসমূহ যা কামনা করে তাই দেওয়া হয়।" [৪]

এছাড়াও বর্তমান হিন্দুধর্মের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর মধ্যে রয়েছে: বারবার জন্ম নেওয়া, ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা করা, যাকে "মোক্শ" (Moksha, মৌক্ষ) বলা হয়। এ পর্যায়ে মানুষ ঈশ্বরের সত্তার সাথে একত্রিত হয়ে যায়; কিন্তু এই ধারণাটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তাই অস্তিত্বের লক্ষ্য হয়ে ওঠে অস্তিত্ব থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টা!

এই ধারণাটি সমাজের জন্য বিপজ্জনক। কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে ভয় থেকে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং যখনই সে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে, ততবারই সে নতুন

করে জন্ম নেবে, আর তাতে করে সে সামনের জন্মে কোন একদিন অবশ্যই মুক্তি পাবে।

এটি বেদের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে যে, জুলুমকারী এবং পাপীদেরকে তাদের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় শাস্তি দেওয়া হয়, যেমন ঋগবেদ বলে: "একটি চূড়ান্ত গভীর স্থান, পাপীদের জন্য, যার গহ্বর অনেক দূরে।" [৫]

বারবার জন্ম নেওয়ার মতবাদ থেকে এ অবস্থানটি তাহলে কোথায়?

তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বর্তমান হিন্দুধর্মের সমস্যা হচ্ছে: বিশ্বজগত সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে এর দৃষ্টিভঙ্গি। বর্তমান হিন্দুধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে: বিশ্বজগত ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আবার তা সুগঠিত হবে, আর এভাবে সমাপ্তি না ঘটে চলতেই থাকবে। আর এটি একটি আশ্চর্যজনক ও স্পষ্ট ভুল যা জ্ঞান ও হাদীসের পরিপন্থী।

এটি সম্পূর্ণ জানা যে, বর্তমান বিজ্ঞান স্বীকার করে যে, এ বিশ্বজগতের একটি সূচনা রয়েছে, তার আগে অন্য জগতসমূহ অতীত হয়নি।

সুতরাং এ বিশ্বজগত পূর্বের কোন নমুনা ছাড়াই সৃষ্টবস্তু।

এটি একদিক দিয়ে বেদে থাকা বিশ্বাসেরই একই বিশ্বাস। বেদে রয়েছে: দুনিয়ার জীবন হঠাৎ করেই প্রকাশ পায়, আর সাথে সাথে রয়েছে আখিরাত। পরবর্তী পর্যায়ে আসা হিন্দুধর্মীয় দর্শন হলো, পুরানসমূহ (Puranas) এর সুস্পষ্ট ভাবে বিশ্বজগতের বারংবার অস্তিত্বে আসা ও তার চিরন্তনতা সম্পর্কে বক্তব্য এসেছে।

বর্তমান হিন্দুধর্মীয় ধর্ম-বিশ্বাস বেদের ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধিতা করে। বর্তমান বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে। এছাড়াও বেদ ইসলামের বিরোধিতা করে যে ইসলাম সে সত্যকে বহন করে যা বেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিমদের ধর্ম-বিশ্বাস, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে অহী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তা হচ্ছে: এ বিশ্বজগত কোন ধরণের পূর্ব নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন:

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾

[البقرة: 117]

“তিনি আসমান ও যমীনসমূহের নমুनावিহীন সৃষ্টিকর্তা। আর তিনি যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত দেন, তখন তিনি তাকে বলেন: হও, তখনই তা হয়ে যায়।” [সূরা আল-বাক্বারা: ১১৭]।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বজগত নমূনাবিহীন একটি সৃষ্টি, তথা এটি পূর্বের কোন নমূনা ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান বিজ্ঞান এ সিদ্ধান্ত পর্যন্তই পৌঁছেছে। আর এ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন ১৪০০ বছর আগে এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ছাগল চরাতেন। যাকে ডাকা হত আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ এবং তিনি ইসলামের নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এ বইয়ে আমি হিন্দুধর্মের অসংখ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন তারা হয়ে থাকে। আর তার বিপরীতে বিশ্ব, জীবন, পুরস্কার, শান্তি, অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং যে সব বিষয়গুলো বেদের অবশিষ্টাংশ ও স্বভাবের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে গুলোও তুলে ধরব।

মানব জাতির জীবন যাপনের পদ্ধতি জানার জন্য মানবিক প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে এবং মানুষের অস্তিত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য সমাধানে ইসলাম কতটা সুস্ক, শক্তিশালী, মজবুত ও মডেল তা আলোচনা করব যা স্বভাব, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের সাথে সামঞ্জস্য হয়।

এই বইটি ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধতার ওপর কতক প্রমাণ এবং বেদ থেকে এ ধর্মের সুসংবাদসমূহকে পেশ করবে। কার্যত এ বেদসমূহ ইসলাম সম্পর্কে এবং রাসূল মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছে এবং হিন্দুদেরকে তার প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছে।

ইসলাম পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মের আওতাধীন কোন ধর্ম নয়; বরং এটি তাওহীদবাদী একক ধর্ম, যা দিয়ে আল্লাহ সমস্ত নবীকে পাঠিয়েছেন। সকল নবীই এসেছেন মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে। আর এ বিশুদ্ধ তাওহীদের উপরে বর্তমানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবশিষ্ট নেই। অপর দিকে বাকি ধর্মসমূহে কম বেশি শিক রয়েছে।

আর আল্লাহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম মানুষের কাছে থেকে গ্রহণ করবেন না, যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾﴾

[আল عمران: 85]

“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার কাছ থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে গণ্য হবে।” [সূরা আলে ইমরান: ৮৫]।

ইসলাম হল সেই ধর্ম যা সহকারে আল্লাহ সমস্ত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল: এতে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার অর্থ রয়েছে। বর্তমান হিন্দুধর্মের মত মূর্তি বা প্রতিমাগুলোর মধ্যে আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করে।

তারপরে বইটি শেষ করা হবে কিভাবে একজন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মুসলিম হবে তার বর্ণনা ও পাশাপাশি ইসলামের অর্থ এবং ইসলামের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা দ্বারা।

তাহলে আল্লাহর বরকতে বইয়ের যাত্রা শুরু করলাম...

১। হিন্দুধর্ম কী?

হিন্দুধর্ম: এটি একটি ধর্ম, অথবা আরো বিশুদ্ধ অর্থে বলতে গেলে- "জীবন পদ্ধতি"। এটি বেশ কতিপয় সাধনা, নিদর্শন, ইবাদত, পবিত্র গ্রন্থসমূহ, জাগতিক বক্তব্য ও অস্তিত্ববাদের সমষ্টি। [৬]

হিন্দুধর্ম বহু শতাব্দী যাবত বিভিন্ন বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট জটিল কতিপয় মতবাদকে একত্রিত করার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে, যা একাধিক বস্তুর বিশ্বাসের অনুমতি দেয় এবং কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী বস্তুর প্রতি বিশ্বাসের অনুমতিও দেয়। বর্তমান হিন্দুধর্মকেও এ ব্যাপারে তুমি অভিন্ন ব্যতিক্রম পাবে না। ফলে বর্তমান হিন্দুধর্ম কোন একটি (নির্দিষ্ট) বিশ্বাস বা একক রেফারেন্স বা অকাট্য নসের অধিকারী নয় যদ্বার বিচার ফায়সালা সম্পন্ন হবে।।

যদিও বেদসমূহ (Vedas) সার্বিকভাবে হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ, তবুও হিন্দুরা -পরবর্তীতে এ পুস্তিকাতে আমরা তা উপস্থাপন করব- অদ্ভুতভাবে এর বিরোধিতা করে এসেছে। ফলে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা বেদের বিরোধিতা করে এমন বিচিত্র সব কল্পিত উপলব্ধি ও ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-ধারণাকে গ্রহণ করেছে, যার সাথে বৈদিক প্রথম যুগের কোনই সম্পর্ক নেই।

সংক্ষেপে হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে: (দুনিয়ার জীবনের) কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া। আমরা পরবর্তীতে তাদের দৃষ্টিতে এ কষ্ট থেকে মুক্তির পদ্ধতির ব্যখ্যা দিব। আরও ব্যখ্যা দিব, কিভাবে তারা এ মুক্তির ক্ষেত্রে বেদের বিরোধিতা করেছে যাতে অসংখ্য অবশিষ্ট সত্য কথা রয়েছে। [৭]

২। এ জটিলতা সমেত কিভাবে এ ধর্মের গোড়াপত্তন ঘটেছিল?

হিন্দুধর্ম মানে ভারত: ভারতীয় রাষ্ট্র, জলবায়ু, ইতিহাস, সংঘবদ্ধতা ও অন্ধানুকরন।

এটি প্রায় ভারতে সীমবদ্ধ হওয়ার মতো একটি ধর্ম, যেখানে বিশ্বের প্রায় ৯৫% হিন্দু রয়েছে।[৮]

প্রাচীনতম বেদসমূহের ঠিক পরবর্তী যুগে হিন্দুধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল। তবে দুর্ভাগ্যবশত, এটি কয়েক শতাব্দীকাল ধরে গঠিত কিছু দর্শন, বিশ্বাস, গ্রন্থাবলী এবং কল্পিত ধারণার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বেদ-পরবর্তী যুগে, হিন্দুধর্ম সন্ন্যাসী, গোপন তন্ত্র (Tantras) এবং ভগবদ্গীতার (ভগবদ্গীতা) শিক্ষা অনুসরণ করেছে।

প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, এই সমস্ত অধিকাংশ কল্পিত ধারণা ও দর্শনসমূহ বেদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল এবং বেদের সাথে সীমালঙ্ঘন করেছিল। যার ফলে আমরা আজ বাইরে থেকে এই কল্পিত ধারণা ও দর্শনসমূহ ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাই না।

৩। হিন্দুদের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস কী?

বর্তমান হিন্দুধর্ম এমন একটি বিশ্বাস, যা বিপুল সংখ্যক দেবতাকে বিশ্বাস করে। হিন্দু ধর্মে অসীম সংখ্যক দেবতা রয়েছে। এতদসত্ত্বেও হিন্দুরা (এসব দেবদেবির সাথে) এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে।

তারা কল্পনা করে, ইলাহ তারা যাদের পবিত্র জানে তার সর্বের মধ্যে ইলাহ অবতরণ করেছে।

এখানে কেউ কেউ মনে করে, হিন্দুদের এক ইলাহের প্রতি বিশ্বাস করা এবং এই মূর্তি এবং আকৃতিপ্রাপ্তগুলোকে ইলাহের প্রতিকৃতি বলে বিবেচনা করা পৌত্তলিকতা নয়।

এটি একটি মারাত্মক ভ্রান্তি।

আর মূর্তিগুলোকে ইলাহের প্রতিকৃতি বলে বিশ্বাস করাই হলো আসল পৌত্তলিকতা। যা প্রতিটি মানবের ইতিহাসে নবীগণের শিক্ষা এবং বেদসমূহের শিক্ষার পরীপন্থী।

নবীগণ এবং বেদসমূহের শিক্ষা বিরোধী প্রতিটি মুশরিক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) করে; কিন্তু তারা মূর্তিগুলোকে ইলাহের প্রতিকৃতি বানায়। তবে মুশরিকদের আল্লাহর অস্তিত্ব ও তিনি এক হওয়ার প্রতি এ ধরনের বিশ্বাস, তাদের আল্লাহর সাথে কুফুরী করা, তার নবীগণ ও

বেদসমূহের সাথে কুফরী করাকে না করে না। যতক্ষণ তারা এ সব মূর্তিগুলোকে গ্রহণ করে।

মূর্তিগ্রহণ (পূজা), অথবা এর নিকটবর্তী হওয়া অথবা এগুলোকে পবিত্র মনে করা নিষিদ্ধ হওয়ার বেদসমূহ স্পষ্ট এবং অকাট্য।

বেদ বলে: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত তৈরীকৃত বস্তুসমূহকে পূজা করবে, সে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এবং আগুনের শাস্তি ভোগ করবে।" [৯]

হিন্দুধর্ম যে সব মূর্তিগুলোর পূজা দ্বারা ভরপুর, সে সব মূর্তিগুলোকে যে গ্রহণ করবে, সে বেদের বাণী মতে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে (নরকে) থাকবে।

বেদ আরও বলে: "সকলের মালিক, অদৃশ্যের জ্ঞানী তো তিনিই, যিনি অন্য কোন ইলাহের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, তিনিই উপযুক্ত যে মানুষ তাঁর অর্চনা করবে। আর যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্যদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা হতভাগ্য, তারা সর্বদা ভীতিকর বড় মুসিবতের সম্মুখীন হবে।" [১০]

বরং ভগবত গীতায় (Bhagavad Gītā भगवद्गीता) রয়েছে: "যারা অসংখ্য ইলাহের পূজা করবে, তারা অসংখ্য ইলাহ পাবে, যারা পূর্বপুরুষদের পূজা করবে, তারা

পূর্বপুরুষদেরকে পাবে, যারা শয়তানের পূজা করবে, তারা শয়তানকে পাবে, আর যারা আমার পূজা করবে, তারা আমাকে পাবে।" [১১]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ এবং এছাড়াও অসংখ্য বর্ণনা স্পষ্টভাবে হিন্দুদেরকে এ সব মূর্তিপূজা ত্যাগ ও আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করে। এমনকি মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছেন: "বেদসমূহে কোন একটি অক্ষরও বিদ্যমান নেই, যা পাথর ও অন্যান্য কিছু দ্বারা তৈরিকৃত মূর্তিসমূহের পূজার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।"

সুতরাং বেদসমূহে থাকা একত্ববাদের বিশ্বাসকে হিন্দুরা পরিত্যাগ করেছে শুধুমাত্র পরবর্তীতে আসা বাতিল বিশ্বাসের হাত ধরে।

আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাযিলকৃত মহিমাম্বিত কুরআন তাগিদ দিয়েছে যে, যারা মূর্তিসমূহের ইবাদত (পূজা) করে, এ বিশ্বাসে যে, তারা এক আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি এসব মূর্তিগুলোকে গ্রহণ করে, তারা মূর্তিগুলোর পূজা করার কারণে আল্লাহকে অস্বীকারকারী।

মহিমাম্বিত কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَعَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
 مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ [الزمر: 38]

“তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।” [সূরা আয-যুমার: ৩৮]। আল্লাহ তা’আলা আরো বলেছেন:

﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ [الزخرف: 87]

“তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।” [সূরা আয-যুখরুফ: ৮৭]।

সুতরাং কুরআন ও বেদের ঐক্যমতেই এ সব মূর্তিগুলো গ্রহণ করা, মানুষকে আল্লাহর অস্বীকারকারী বানিয়ে দেয়।

মহিমাম্বিত কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ [العنكبوت: 17]

“তোমরা তো আল্লাহ্ ছাড়া শুধু মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তারা তো তোমাদের রিষিকের মালিক নয়। কাজেই তোমরা আল্লাহ্ কাছেই রিষিক চাও এবং তাঁরই ইবাদাত কর। আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।” [সূরা আল-আনকাবূত: ১৭]।

সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে রিষিক অন্বেষণ কর এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর। কেননা তাঁর কাছেই আমরা সবাই ফিরে যাব।

আর বর্তমানে যমীনের বুকে ইসলাম ছাড়া আল্লাহর একত্ববাদ এবং সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত অন্য কোন ধর্ম অবশিষ্ট নেই।

অতএব, প্রত্যেক হিন্দুর জন্য উচিত, কোন গোঁড়ামী ছাড়াই ইসলামকে গভীর দৃষ্টি সহকারে দেখা, আর এ ধর্মে থাকা একত্ববাদের বিশ্বাসের দিকে দেখা, এটি কি তার স্বভাবজাত প্রকৃতি ও বেদে যা আছে, তার সাথে সামঞ্জস্যশীল, নাকি সামঞ্জস্যশীল নয়?

নিশ্চয় মানুষের কাছে আল্লাহ যে সকল নবীদেরকে প্রেরণ করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের দাওয়াত ছিল:

ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক গণ্য করা। আর তা হবে: সকল মূর্তিকে অপসারণ ও আল্লাহর রাসূলগণ এবং সর্বশেষ নবী আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, সেগুলোর প্রতি আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে।

৪। হিন্দুধর্মে এক ইলাহকে অসংখ্য মূর্তির মাধ্যমে প্রতিকৃতি প্রদানের চিন্তাধারার কিভাবে উদ্ভব ঘটেছিল?

বৈদিক যুগের পরে বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রধান সমস্যা হল: তারা মনে করত, ইলাহের একাধিক গুণ একাদিক সত্তা দাবিদার।তথা: একাধিক (ইলাহ) দেবতার প্রয়োজন।

তারা আবশ্যিক মনে করত, ইলাহের প্রতিটি সিফাতের জন্য একটি মূর্তি রয়েছে, যা সেই ইলাহের প্রতিকৃতি।

সুতরাং তাদের নিকটে সৃষ্টিকর্তা পরিণত হয়েছেন (তিনটি রূপে):

ব্রহ্মা: যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা।

বিষ্ণু: এ দৃষ্টিতে যে, তিনি বিশ্বজগতের রক্ষক।

এবং শিব: এ দৃষ্টিতে যে, তিনি মহাবিশ্বের ধ্বংসকারী।[১২]

এটি একটি অনুমান, যা যুক্তি ও প্রবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধতা এবং বেদে যা পাওয়া যায় তার বিরোধিতা করে; কারণ একাধিক গুণ থাকা একাধিক সত্তার থাকার দাবী করে না।

কোন ব্যক্তি একাধারে একজন বুদ্ধিমান, শক্তিশালী এবং সাহিত্যিক হতে পারেন।

সুতরাং একাধিক গুণাবলীর কারণে উক্ত মানুষের বহু সত্তার অধিকারী হওয়া আবশ্যিক হয় না।

অতএব একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই শক্তিশালী, সে নিজেই একজন সাহিত্যিক।

এবং আল্লাহর জন্য রয়েছে মহান উদাহরণ।

বেদও এই একই সত্যকে নিশ্চিত করে, যেমনটি ঋগবেদে উল্লেখ করা হয়েছে: "তাকে বলা হয়: ইন্দ্র, মিত্র, বায়ু, তিনি হচ্ছেন মাতরিশ্বা। জ্ঞানীরা এক প্রভুকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করে।" [১৩]

আর আল্লাহর (প্রভুর) নামসমূহ এবং গুণাবলী সংক্রান্ত অসংখ্য পাঠ (দলিল) বেদে রয়েছে।

সুতরাং নামসমূহ এবং গুণাবলী একই সত্তার মধ্যে বিদ্যমান থাকতে পারে।

এটিই হচ্ছে প্রথম বেদসমূহ যার উপরে ছিল, সে বিশ্বাস, আর ইসলামী বিশ্বাসও এটাই। সুতরাং আল্লাহ সুবাহানাল্হ তিনি এক। তাঁর রয়েছে সবচেয়ে সুন্দর নামসমূহ এবং সর্বোচ্চ গুণাবলী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 163]

“আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, দয়াময়, অতি দয়ালু তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই।” সূরা আল-বাকারা: ১৬৩।

সুতরাং আল্লাহ, তিনিই রহমান (দয়াময়) এবং রহীম (দয়াময়)।

মহিমান্বিত কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলছেন:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: 23]

“তিনি আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, মহাপবিত্র, শান্তি-ক্রটিমুক্ত, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত। তারা যা শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান।” সূরা আল-হাশর: ২৩।

সুতরাং নামসমূহ এবং গুণাবলীর ভিন্নতা এক আল্লাহর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হল: বিভিন্ন মূর্তির রূপে প্রভুর গুণাবলীকে মূর্ত করার ধারণা, এ পৌত্তলিকতার ফলে মহাবিশ্বের কোন নিরাপত্তা নেই।

এ কারণে, পবিত্র কুরআন আল্লাহর থেকে এ সমস্ত যাবতীয় পৌত্তলিক ধারণাকে অস্বীকার করে এবং প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য দেবতাদের গ্রহণ করার মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্বের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়।

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا

يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ [الأنبياء: 22]

"যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অনেক ইলাহ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃঙ্খল হত। অতএব, তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ কতই না পবিত্র।" সূরা আল-আম্বিয়া: ২২।

যদি আল্লাহর সাথে আরো অনেক ইলাহ থাকত, তাহলে আসমানসমূহ ও যমীন বিনষ্ট হয়ে যেত।

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ

بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ [المؤمنون: 71]

“আর হক্ক যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত তবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত আসমানসমূহ ও যমীন এবং এগুলোতে যা কিছু আছে সবকিছুই। বরং আমরা তাদের কাছে নিয়ে এসেছি তাদের ইজ্জত ও সম্মান সম্বলিত যিকর, কিন্তু তারা তাদের এ যিকর (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” সূরা আল-মুমিনূন: ৭১।

৫। হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ককে কীভাবে দেখে?

বর্তমানে হিন্দুধর্মের অধিকাংশ মানুষ ওয়াহদাতুল উযূদ (সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার আত্মার একাত্মতার মতবাদ)-এ বিশ্বাস করে। ফলে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিবস্তুর সাথে একাকার। সুতরাং বর্তমান হিন্দুধর্মে ইলাহ তাঁর সৃষ্টবস্তুর বিস্তৃত। আর এতে অস্তিত্ব দানকারী অস্তিত্বে থাকা বস্তু একই জিনিস। [১৪]

আর এ দর্শনটি বিজ্ঞান, যুক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং বেদের সহজতম স্বতঃসিদ্ধের বিপরীত।

ওয়াহদাতুল উযূদ (সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার আত্মার একাত্মতার মতবাদ)-এর দর্শনে অসংখ্য জ্ঞানগত (বৈজ্ঞানিক) ও যুক্তিক সমস্যা-প্রশ্ন রয়েছে। যেমন:

প্রথম সমস্যা: তাদের মতে প্রভু সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যমান, তাহলে প্রভুর সাথে একাত্মতা লাভের জন্য আচার-অনুষ্ঠান বা সাধনা করার অর্থ কী? যা "মোক্শ"(Moksha, মৌক্ষ) নামে পরিচিত?

আপনি কিভাবে এমন কিছুতে পৌঁছাবেন যা আপনার মধ্যে রয়েছে...আপনি এতে বিদ্যমান এবং সে আপনার মধ্যে বিদ্যমান?

দ্বিতীয় সমস্যা: তাদের অস্তিত্বের একাত্মতার ধারণা মতে, ভুল-ক্রটি এবং পাপও প্রভুর সত্তা; কেননা তাদের কাছে প্রভু নিজেই ভুল-ক্রটি, এবং তিনি নিজেই পাপ, তিনি নিজেই ব্যভিচার, তিনি নিজেই হত্যা; যেহেতু তিনি প্রতিটি বস্তুর মাঝেই বিলীন; তাহলে ভুল-ক্রটি এবং পাপ থেকে কেন নিষ্কৃতি পেতে হবে?

কেন তারা পার্থিব কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকতে এত আগ্রহী?

ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ তথা সর্বেশ্বরবাদের মধ্যেই কি পাপ নেই?

পৃথিবী কি নিজেই সত্তাগত প্রভু (এর অংশ) নয়?

বর্তমান হিন্দুদের এ ধারণা অনুসারে ভাল কাজ করার জন্য উদগ্রীব হওয়ার কোন যুক্তি নেই।

কিন্তু সবাই ভাল কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং এটিকে আবশ্যিক কর্তব্য হিসেবে জানে, তাই না?

ভাল কাজ করার আগ্রহ হল পবিত্র প্রবৃত্তির আহ্বানে সাড়া দেওয়া। সুতরাং এটি অস্তিত্বের একাত্মতা দর্শনের ভ্রান্তির প্রত্যক্ষ একটি সহজাত প্রমাণ।

তৃতীয় সমস্যা: ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ তথা সর্বেশ্বরবাদ বিশ্বাস বাস্তবতার আপেক্ষিকতার দর্শনের দিকে আহ্বান

করে; কারণ সমস্ত ধর্ম, যারা মূর্তি বা পাথরের পূজা করে, তাদের দৃষ্টিতে সেটি মূলত প্রভুর উপাসনা। কেননা তাদের উপলব্ধিতে তিনিই মূর্তি এবং তিনিই পাথর। তাই প্রভু সব কিছুর মধ্যেই আছেন এবং তিনিই সবকিছু।

বাস্তবতা প্রেক্ষিতে এ দর্শন সকল অর্থ ও মূল্যবোধকে ধ্বংসের দিকে আহ্বান করে, ফলে সবকিছুই সঠিক হয়ে যাবে।

উপরের বিষয়ের সাথে আরো একটি বিষয় যোগ করুন, তা হচ্ছে: ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদের বিশ্বাস একটি প্রশ্নের উত্তর দেয় না: পৃথিবী কোথা থেকে এসেছে?

তাই স্রষ্টার সত্তাকে সৃষ্ট বস্তু সত্তা ধরে নেয়া, এটি যুক্তির দিক দিক দিয়ে বাতিল। কারণ এতে ধরে নেওয়া হয় যে, কোন বস্তুর প্রকাশ পাওয়ার সম্পর্ক উক্ত বস্তুর প্রকাশ পাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

এটি অত্যন্ত আজব একটি গড়মিল এবং বিবেকগত অসম্ভবও।

কিভাবে একটি জিনিস নিজের আত্মপ্রকাশের কারণ সেটি নিজেই। যখন সেটি এখনও অস্তিত্বে আসেনি?

চতুর্থ সমস্যা: এটি বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই নশ্বর এবং এটি সকল বিবেকবান মানুষের কাছেই সাব্যস্ত প্রমাণিত।

মহাবিশ্ব তার সমস্ত শক্তি, পদার্থ, স্থান এবং সময় সমেত একটি নশ্বর বস্তু...

অসংখ্য প্রমাণের মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত যে, মহাবিশ্বের একটি শুরু ছিল। সুতরাং বৈজ্ঞানিকভাবে: কোন এক সময় মহাবিশ্ব ছিল না এবং তারপরে মহাবিশ্ব প্রকাশ পেল।

আর যখন মহাবিশ্ব ছিল না, তখন আমরা ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদ কিভাবে বলব?

যদি ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদ সত্য হয়, তবে এর জন্য আবশ্যিক পৃথিবীর অবিদ্যমান হওয়া, অথবা অন্ততপক্ষে পদার্থের চিরন্তনতা।

আশ্চর্যজনকভাবে, সমসাময়িক হিন্দুরা জোর দিয়ে বলে যে, বস্তুজগৎ চিরন্তন। কারণ এটি এমন একটি প্রয়োজনীয় উক্তি যা ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদ প্রমাণে আবশ্যিক।

হিন্দু পণ্ডিত বিবেকানন্দ (Wiwekanand) বলেছেন: "স্থান কোন সময় এবং নব অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত হয় না।"[১৫]

বর্তমান হিন্দুরা এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, বস্তুজগত চিরন্তন, যাতে করে ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদের ধারণার সাথে তাদের কথা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

এতে তাদের প্রবেশ করাটা ঠিক ছিল না, আর প্রথমে তাদের অস্তিত্বের একত্ববাদে বিশ্বাস করাটাও সঠিক ছিল না। কিন্তু শয়তান আদম সন্তানের সব পথে বসে থাকে, মানুষদেরকে নবীদের দীন (ধর্ম) থেকে বিচ্যুত করে। যখনই সুযোগ পায় তা কাজে লাগায়।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: “নিশ্চয় আমি আমার বান্দাদেরকে (দীনের উপরে) একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি, তারপর তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে তাদের দীন থেকে বিচ্যুত করেছে। তাদের উপর সে ঐ সমস্ত বস্তু হারাম করে দিল, যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছিলাম। সে তাদেরকে নির্দেশ করল যেন তারা আমার সাথে শরীক স্থাপন করে, যার সপক্ষে আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি।” [১৬]

সুতরাং প্রতিটি মানুষই আল্লাহর একত্ববাদের উপরে ছিল, তারপরে তাদের কাছে শয়তান আগমন করল, আর তাদেরকে এসব কুফুরীর মাধ্যমে প্রতারিত করল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় শয়তান আদম সন্তানের পথগুলোতে বসে থাকে।” [১৭]

সুতরাং শয়তান মানুষের ভ্রষ্টতার জন্য সব ধরনের উপায় খুঁজতে থাকে। আর নবীগণ যে একত্ববাদ ও ইবাদাতের উপরে ছিল, তা মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পরিত্রানের পথ নেই।

বেদ স্পষ্টভাষায় বলছে যে, বিশ্বজগত সৃষ্ট, এবং এর একটি সূচনা রয়েছে।

আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান নন।

তাহলে হিন্দুরা ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদের এ বিশ্বাসের পর্যায়ে কিভাবে পৌঁছালো?

ঋগবেদ (ঋগ্বেদ) বলে: "হে আল্লাহ (ভগবান)! সূর্য ও বিশ্ব তাদের উভয়েরই এ ক্ষমতা নেই যে, তারা আপনাকে আয়ত্ব করবে এবং আপনাকে ধারণ করবে।" [১৮]

এটি বেদ থেকে একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদের বিশ্বাস ভুল। আল্লাহ (প্রভু) তাঁর সৃষ্টি থেকে স্বাধীন সত্তা, এবং সূর্য ও চন্দ্রও ইলাহ বা প্রভু নয়।

ঋগবেদ আরো বলে: "আল্লাহ (প্রভু) তিনিই, রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনিই জগতের এবং এর মধ্যে যা

কিছু আছে তার মালিক। এবং তিনিই সূর্য ও চন্দ্র, যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন।” [১৯]

সুতরাং অস্তিত্বের একাত্মতা ও বস্তুজগতের চিরন্তনতার বিশ্বাসকে নাকচ করার ক্ষেত্রে এর থেকে আর অন্য কোন স্পষ্ট দলীল থাকতে পারে কি?

যজুর্বেদ বলে: “তিনি হচ্ছেন এমন সত্তা, যার পূর্বে কোন বস্তু সৃষ্টি হয়নি। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের মালিক আর তিনি সবকিছু জানেন।” [২০]

সুতরাং মহাপ্রভুর (আল্লাহর) আগে অন্য কোন বস্তু সৃষ্টি হয়নি, তিনিই প্রথম, মহাবিশ্ব নশ্বর আর তা আল্লাহরই সৃষ্টি, তিনিই আসমান-যমীনের মহান মালিক।” [২১]

আর কুরআন কারীমও এ একই মহাসত্যের কথা বলেছে, আল্লাহ তা’আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ১৪০০ বছর আগে অহী প্রেরণ করেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগত থেকে পৃথক, তিনি তাঁর আরশের উপরে উঠেছেন, কোন সৃষ্টবস্তু তাঁর সাথে একীভূত হতে পারে না, আর তিনিও কোন কিছুর সাথে একীভূত হন না।

আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ

الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ [السجدة: 4]

“আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের অন্তর্ভুক্তি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই ও সুপারিশকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” সূরা আস-সাজদাহ: ৪।

সুতরাং নবীগণের বিশ্বাসের মূলকথা এবং তাদের দীন (ধর্ম) ও শরী'আতের মূলকথা হচ্ছে: আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, একক, অদ্বিতীয়, পৃথক, তথা: তাঁর সৃষ্টিজগত থেকে আলাদা, এবং তাদের মধ্যে তিনি বিরাজিত নন।

ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদের বিশ্বাসের পঞ্চম সমস্যা হচ্ছে: এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, তা হচ্ছে: বিশ্বজগত কোথা থেকে এসেছে?

এ দর্শন অনুযায়ী পৃথিবী কিভাবে উদ্ভব হয়েছিল?

তারপরে: এ দর্শনের প্রথম প্রবক্তা কে?

এর প্রমাণই বা কী?

আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তি, বেদ এবং নবীদের ধর্মের বিপরীত এই বিশ্বাসকে ঘিরে আরো অনেক প্রশ্ন এবং সমস্যা রয়েছে।

৬। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে হিন্দুধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?

আজকের হিন্দুধর্ম পুনর্জন্মের ধারণা এবং প্রজন্মের অন্তর্হীন চক্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত: হিন্দু চিন্তাধারার আলোকে আমরা পুনর্জন্মের একটি বৃত্তাকার চক্রে আবর্তিত হই, প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারী সত্তা তার আগে অন্য আরেকটি সত্তায় অস্তিত্ববান ছিল এবং তার আত্মা তার মৃত্যুর পরে আবার অন্য সত্তায় চলে যাবে, এভাবে চলতে থাকে। আর এটি হিন্দুধর্মে "সংসার"(Saṃsāra, संसार) হিসেবে পরিচিত।[২২] আত্মার এ স্থানান্তরের বিশ্বাসের সাথে বেশ কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বৈজ্ঞানিক সমস্যাও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথম সমস্যা: এটি "টারটুলিয়ানের আপত্তি" (Tertullian's objection) নামে পরিচিত, তিনি বলেছেন: স্থানান্তর (পুনর্জন্ম) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের মতো একই মানসিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে না?[২৩]

দ্বিতীয় সমস্যা: যদি আত্মার পুনর্জন্ম সত্য হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, জীবের সংখ্যা স্থির; কারণ তারা জন্মের

চক্রে একে অপরের মধ্যে পুনর্জন্ম পেয়েছে; অথচ এটি আজকের দিনে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির বলবে না!

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এমন একটি সময় ছিল যখন এ গোলাকার পৃথিবী ও জীবিত প্রাণীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। আর একটি সময় এমনও ছিল যখন জীবগুলি এই সমান সংখ্যায় জীবিতাকারে ছিল না; বরং এদের সংখ্যা খুবই কম ছিল, তারপর সময়ের ব্যবধানে সেগুলো বৃদ্ধি পায়। আর এ বিষয়ের উপরে আজকের মানুষ ঐক্যমত।

একটা সময় ছিল যখন এখনকার চেয়ে মানুষের সংখ্যা ছিল খুব কম।

সুতরাং মানুষের সংখ্যা সর্বসম্মতভাবে স্থির নয়। তাহলে কিভাবে আত্মার পুনর্জন্ম নির্দিষ্ট চক্রে ঘটে থাকে?

তৃতীয় সমস্যা: এই দর্শনের অনুসারীরা ব্যতীত পূর্বজন্ম – পূর্বে অতিবাহিত জীবন- এর কথা অন্যদের মনে থাকে না কেন?

রুথ সিমন্স (Ruth Simmons) নামে একজন আমেরিকান মহিলা ছিলেন, যিনি ব্রাইডি মারফি (Bridey Murphy) নামে অন্য একজন মহিলার পুনর্জন্ম বলে দাবি করেছিলেন এবং রুথ সিমন্স আয়ারল্যান্ডে উনিশ শতকে যখন তিনি ব্র্যাডি মারফি ছিলেন, তখনকার তার অতীতের

স্মৃতি মনে করতে শুরু করেছিলেন। এরপরে গবেষকরা রুথ সিমন্সের জীবন অনুসন্ধান করার পরে জানা গিয়েছিল যে, তার একটি আয়ারল্যান্ডের পুরানো প্রতিবেশী ছিল, তার নাম ছিল ব্র্যাইডি মারফি এবং তিনি আয়ারল্যান্ডের ব্যাপারে ব্র্যাইডির স্মৃতি গ্রহণ করেছিলেন এবং সেগুলিকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে দাবি করেন যে, তিনিই ব্র্যাইডি।[২৪]

সুতরাং আত্মার স্থানান্তর (পুনর্জন্ম) একটি বিভ্রম এবং কল্পনা মাত্র এবং এটি বিজ্ঞান এবং ইন্ড্রিয়ের সহজতম স্বতঃসিদ্ধের বিপরীত।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব ফিলোসফির প্রধান সম্পাদক এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল এডওয়ার্ডস বলেছেন: "পুনর্জন্ম একটি কল্পনা যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক।"[২৫]

সুতরাং মানুষ মারা গেলে কখনোই [দুনিয়ায়] অন্য জীব হয়ে জন্ম নেয় না।

বেদ সর্বদা এই সত্যের উপরেই জোর দেয় এবং বেদে পুনর্জন্ম বা সংসারের কোন কথা নেই।[২৬]

এমনকি হিন্দু পণ্ডিত শ্রী সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার বলেছেন: "পুনর্জন্মের বিশ্বাস বেদসমূহে নেই। যারা আছে বলে দাবী করে, আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি।"[২৭]

বিদ্যালঙ্কারের কথা সত্য হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে, হিন্দুরা একটি প্রাচীন ধর্মীয় আচার পালন করে যাকে বলা হয়: শ্রাদ্ধ (Śrāddha শ্রাদ্ধ), এবং এই আচারের উদ্দেশ্য হল: মৃতদের আত্মাকে শান্ত করা।

তাহলে কিভাবে আত্মার পুনঃজন্ম হয়, যখন হিন্দুরা মৃতদের আত্মাকে শান্ত করে দেয়?

আর কুরআন কারীম, যা আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে নাযিল করেছিলেন, সেখানে তিনি ঐ সকল জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকার প্রবক্তাদেরকে ভ্রান্তির অপনোদন করেছেন, যারা বলে:

﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المؤمنون: 37]

"একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই। আর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে না।" সূরা আল-মুমিনুন: ৩৭। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর মহাগ্রন্থ কুরআনে বলেছেন:

﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [يس:]

[31]

“তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি তাদের আগে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি? নিশ্চয় তারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না।” সূরা ইয়াসিন: ৩১।

তাই যে ব্যক্তি মারা যাবে, সে দুনিয়াতে ফিরে আসবে না অথবা সে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করবে না। [২৮]

আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

[الدخان: 56]

“তারা এখানে প্রথম মৃত্যু ছাড়া অন্য মৃত্যুকে আশ্বাদন করবে না।” সূরা আদ-দুখান: ৫৬।

এটি মুসলমানদের বিশ্বাস এবং এটি বেদেরও বিশ্বাস, যা দুর্ভাগ্যবশত হিন্দুরা পরিত্যাগ করেছে।

পুনর্জন্মের চতুর্থ সমস্যা: তারা দাবি করে যে, চূড়ান্ত লক্ষ্য হল: এই বারবার জন্ম নেওয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে পরমের সাথে একীভূত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছানো বা যা মোক্ষ নামে পরিচিত। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়: বারবার জন্ম হওয়া একটি শাস্তি (আযাব)।

কিন্তু কে বলেছে যে বারবার জন্ম নেওয়া শাস্তি?

বেশিরভাগ লোককে যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর যে: আপনি আবার জন্ম নিতে চান এবং আবার জীবন অনুভব করতে চান? তাদের মধ্যে অনেকেই হ্যাঁ উত্তর দিতে দ্বিধা করবে না।

তদুপরি, শাস্তি হিসাবে অস্তিত্বের এই হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একটি মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি; কারণ অস্তিত্বের মধ্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে এবং রয়েছে অগণিত নি'আমাত।

সুতরাং মোক্ষ হল এমন একটি ধারণাপ্রসূত মুক্তির পন্থা, যার কোন বাস্তবতা নেই!

পঞ্চম সমস্যা: পুনর্জন্মের দর্শন অপরাধ বা অবাধ্যতার প্রতি উদাসীনতার দিকে ঠেলে দেয়; কারণ এতে করে অপরাধ সংঘটন সঠিক বলে অনুমোদিত হয়। কারণ মানুষ অনিবার্যভাবে পরবর্তী জন্মসমূহের মধ্য হতে কোন একটি জন্মে পরিত্রাণ পাবে। সুতরাং সে যে জন্মে বর্তমানে রয়েছে, সেখানে তার উপভোগ করা উচিত।

এ কাজটি নিশ্চিতভাবে যে কোন ধরনের অপরাধে বারবার লিপ্ত হওয়াকে প্রলুব্ধ করে। আর সম্ভবত এ কারণেই ভারতে বিশ্বব্যাপী অপরাধের হার সবচেয়ে বেশি, বিশেষভাবে ধর্ষণের অপরাধ। [২৯]

ভারতে গণধর্ষণ অপরাধের হার সবচেয়ে বেশি।

৭। হিন্দুদের কাছে বারবার জন্ম নেওয়া ও পুনর্জন্ম ধারণার উৎস কী?

এ ধারণাগুলো কিভাবে উদ্ভূত হয়েছিল, কে এগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিল বা এর প্রমাণই বা কি? তা কেউ জানে না।

বেদে পুনর্জন্মের কোন প্রমাণ নেই, বেদে পুনর্জন্ম সম্পর্কে একটি শব্দও নেই এবং এই ধারণাগুলো শুধু পরবর্তীকালে পুরাণের (Puranas) দর্শনগুলোতে উল্লেখিত হয়েছিল।

এটা অসম্ভব নয় যে, এই চিন্তাসমূহ একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল, যেমনটি পানাহার না করে দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকার ফলে এক ধরনের কল্পনার উদয় ঘটে, যেভাবে প্রাণ (Prana) সাধনার মধ্যে করা হয়।

জ্ঞাতব্য যে, প্রাণ সাধনার সময়ে পানাহার পরিত্যাগ করে, একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে (ভঙ্গিতে) দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকতে হয়।

এভাবে পানাহার ব্যতীত একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এই সম্পূর্ণ নীরবতা, রক্তের গ্লুকোজ হ্রাসের কারণে মস্তিষ্কের আয়নগুলোতে ভারসাম্যহীনতার দিকে

নিয়ে যায়, তাই এন্ডোরফিনের অনিয়ন্ত্রিত নিঃসরণ ঘটে এবং প্রকৃত হ্যালুসিনেশন (দৃষ্টিভ্রম) ঘটতে শুরু করে। [৩০]

সুতরাং সন্ন্যাসীরা যা মনে করেন এবং বারবার জন্ম গ্রহণ নিয়ে পুরাণে যা লিখেছেন, তা হ্যালুসিনেশন বা মস্তিষ্কের অসাড়তার কাছাকাছি একটি বিষয় মাত্র।

এটি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিবেদন অনুসারে, যেমন ইউএস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি রিসার্চ, যা একটি সরকারি ওয়েবসাইট এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম চিকিৎসা গবেষণা রেফারেন্স অনুসারে, এটি বলে: দীর্ঘ সময় যাবত রক্তে গ্লুকোজ স্বল্পতা হ্যালুসিনেশনের (দৃষ্টিভ্রম) দিকে পরিচালিত করে।[৩১]

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “জ্ঞান বঞ্চিত উপাসনাকারী ব্যক্তি যখন দুনিয়া বিমুখ হয়, একাগ্রতা অর্জন করে আর ক্ষুধার্ত হয়, ফলমূল ও গোশত [খাওয়া] পরিত্যাগ করে, আর ছোট ছোট রুটির টুকরা খাওয়াতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে, তখন আত্মার বিপদ তাকে পেয়ে বসে, শয়তান তার ভিতরে আসা-যাওয়া করে, তখন তার ধারণা হয় যে, সে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে, তাকে সম্বোধন করা হচ্ছে, আর সে আধ্যাতিকতার উচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ হচ্ছে, তখন শয়তান তার উপরে বিজয়ী হয় এবং তাকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।” [৩২]

এ কারণেই ইসলাম এভাবে সংযম সাধনা এবং এ রকম পদ্ধতিতে নিজের আত্মার উপরে কঠোরতা আরোপ করার ব্যাপারে সতর্ক করেছে।

নিজের উপর এ ধরনের কঠোরতা আরোপ সময়ের বিভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা এবং ধর্মকে বিনষ্টের দিকে নিয়ে যায়।

মহিমান্বিত কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾﴾ [الأعراف: 32]

“বলুন, আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও উত্তম জীবিকা তৈরী করেছেন তা কে হারাম করল?” সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা তোমাদের নিজেদের উপরে কঠোরতা আরোপ করো না, যাতে আল্লাহ তোমাদের জন্য কঠিন করে দিবেন; কেননা [অতীতে] একদল মানুষ তাদের নিজেদের উপরে কঠোরতা আরোপ করেছিল, সুতরাং তখন আল্লাহও তাদের উপরে কঠিন করে দিয়েছিলেন, আর এগুলো হলো তাদের অবশিষ্ট নির্জনগৃহে ও গীর্জাসমূহে রয়ে গেল।

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
 وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ
 إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٧﴾ [الحديد: 27]

“বৈরাগ্যবাদকে তারাই আবিষ্কার করেছিল, যা আমি তাদের উপরে আবশ্যিক করিনি।” সূরা আল-হাদীদ: ২৭।[৩৩]

এই কঠোরতা হ্যালুসিনেশন তৈরি করেছিল, যার থেকে বেদ-বিরোধী ধারণাগুলো তৈরি হয়েছিল, যা আজ হিন্দুধর্মের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত।

আর যদি আমরা এর বিপরীতে প্রকৃত মুজেযার ঘটনাগুলো দেখি, যেগুলোর সাহায্যে আল্লাহ তাঁর নবীদের সাহায্য করেন, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, মুজেযা বা অলৌকিক ঘটনাগুলো আকস্মিকভাবে এবং কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই ঘটে থাকে এবং লোকেরা তাদের নিজেদের চোখে দেখে এবং প্রত্যক্ষ করে, আর মানুষ কখনোই তার অনুরূপ করতে পারে না।

এই হল নবীদের ঘটনা এবং হিন্দু মতবাদে বিশ্বাসী সন্ন্যাসীদের ঘটনাগুলোর মধ্যে পার্থক্য।

৮। হিন্দুরা মহাবিশ্বের প্রতি কীভাবে দৃষ্টি দেয়?

হিন্দুদর্শন অনুসারে মহাবিশ্ব দ্রবীভূত বা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় থাকে। তারপরে পুনরায় আবির্ভূত হয় এবং তা স্থায়ী পদ্ধতিতে ঘটতে থাকে।

মহাবিশ্ব গঠিত হয়, তারপর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তারপর পুনরায় গঠিত হয় এভাবে চলতে থাকে।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে এ ধারণা যে, তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পরে আবার গঠিত হয়, এটি একটি বৈজ্ঞানিক ত্রুটি।

মহাবিশ্বের আগে বৈজ্ঞানিকভাবে আর কোন মহাবিশ্ব অতিবাহিত হয়নি। বরং এটি পূর্বের কোন নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি ও আবিষ্কৃত।

এটিই মুসলিমদের বিশ্বাস, যা ১৪০০ বছর আগে মক্কার জনগণকে স্বপ্ন পরিসরে ছাগল চরানো এক ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছিলেন, যাকে বলা হয় মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ, আর তিনি আল্লাহর রাসূল এবং ইসলামের নবী। আল্লাহ তাঁর কাছে অহী পাঠিয়েছিলেন যে, এ মহাবিশ্ব পূর্বের কোন নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারীমে বলেছেন:

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ﴾

[البقرة: 117]

“তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের উদ্ভাবক। আর যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়।” সূরা আল-বাকারা. আয়াত: ১১৭।

৯। হিন্দুধর্ম অনুসারে মানুষের শরীর কিসের তৈরী?

হিন্দুধর্ম অনুযায়ী, মানবদেহ পাঁচটি উপাদানের শক্তি দ্বারা গঠিত: জল (পানি), মাটি, বায়ু, আগুন এবং ইথার।

সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা এই পাঁচটি উপাদান থেকে গঠিত।

পাঁচটি উপাদানের প্রত্যেকটির (বিপরীতে) অনুরূপ গ্রহ রয়েছে। মঙ্গল হচ্ছে: অগ্নিময়, এবং শনি হচ্ছে: পার্থিব, এবং মানুষের প্রতিটি অঙ্গের মুকাবালায় পাঁচটি উপাদানের একটি রয়েছে। যেমন: প্লীহা পার্থিব এবং হৃদয় অগ্নিময়।

প্রকৃতপক্ষে, অস্তিত্বে যা কিছু আছে, সব কিছুই পাঁচটি উপাদান অনুসারে দুইভাগ করা হয়েছে, এমনকি সময় বা কালও। তাদের কাছে রোগ হচ্ছে এ পাঁচটি উপাদানের ভারসাম্যহীনতার নাম।

পাঁচ উপাদানের ধারণাটি 'প্রাণ' (সাধনা)-এর দ্বারা জনপ্রিয় হয়েছিল, যা ক্ষুধার্ত অবস্থার সাধনা এবং ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সম্পূর্ণ স্থিরতার সাথে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকত।

দুর্ভাগ্যবশত, পাঁচটি উপাদানের ধারণা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং শক্তি থেরাপির (Energy Therapy) এর অসংখ্য বিজ্ঞান তার ওপর নির্ভর।

এনার্জি থেরাপি, ম্যাক্রোবায়োটিক, ফেং শুই, কালার থেরাপি এবং এই জাতীয় অন্যান্য (চিকিৎসা) অনুশীলনের বিজ্ঞান এই উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

তাদের কাছে এ পাঁচটি উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করলে রিষিক লাভ এবং খারাবী দূর করা যায়।

বর্তমানে হিন্দু মন্দিরগুলোতে এ পাঁচটি উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ম্যাসেজ বা মালিশ করা হয়; কারণ এটি অনেক রোগের নিরাময়।

আর পাঁচটি উপাদানের এ ধারণাটির কথা কোন ভাবেই বিজ্ঞানসম্মত নয়।

পদার্থবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যার সাথে এর কোন ধরনের সম্পর্ক নেই।

বরং বিজ্ঞান এ ব্যাপারটি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট চর্চাকে এক ধরনের কুসংস্কার, প্রলাপ ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করে।

পাঁচটি উপাদানের এ ধারণাকে ইতোমধ্যেই ছদ্মবিজ্ঞান (সিউডোসায়েন্স) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। [৩৪]

এর সাথে জড়িত চর্চা বা অনুশীলনগুলো কল্পনা এবং বিভ্রম হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। [৩৫]

পাঁচটি উপাদানের ধারণাটি হয়ত একজন সন্ন্যাসীর মনে একইভাবে উদ্ভূত হয়েছিল যেভাবে বারবার জন্ম গ্রহণ এবং পুনর্জন্মের ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছিল; কারণ এর পিছনে কোন বিবেকপ্রসূত, বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক প্রমাণ নেই।

সুতরাং এটি একটি কাল্পনিক ধারণা মাত্র।

সমস্যা হলো, এই ধারণার অনুশীলনগুলো কেবল এমন পৌত্তলিক যাদুবিদ্যা, গ্রহ, আকার-আকৃতি, প্রতীক, রঙ এবং তাবিজের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ব্যাপারে আল্লাহ কোন ধরণের প্রমাণ নাযিল করেননি। [৩৬]

পাঁচটি উপাদানের ধারণার সাথে সম্পর্কিত এই অনুশীলনগুলোর বিরুদ্ধে সতর্ক করার ক্ষেত্রে ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞান থেকে এগিয়ে রয়েছে; কারণ এই অনুশীলনগুলো সঠিক চিকিৎসা গ্রহণে বিলম্বের দিকে ধাবিত করে, বাস্তব জগতের পাশাপাশি মানুষকে বিভ্রান্তের মধ্যে জীবনযাপনের দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষকে আল্লাহ

ব্যতীত অন্যান্য সত্তার সাথে সম্পর্কিত করার দিকে পরিচালিত করে। তাই ইসলাম এইসব অনুশীলন বা চর্চার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আমার বান্দাদের মধ্যে কতিপয় বান্দা সকালে মু'মিন হিসেবে এবং কতিপয় বান্দা কাফির হিসেবে উঠেছে। সুতরাং যারা বলেছে: আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং গ্রহের উপরে অবিশ্বাসী, আর যারা বলেছে: অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি, তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং গ্রহসমূহের প্রতি বিশ্বাসী।" [৩৭]

সুতরাং যে ব্যক্তি গ্রহসমূহ এবং মানুষের উপর তাদের প্রভাব এবং এগুলো জীবিকার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে বলে বিশ্বাস করে, সে আল্লাহকে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই মানুষের ভাগ্যে গ্রহের হস্তক্ষেপে অবিশ্বাস করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও কবজ হচ্ছে শিরক।" [৩৮]

অতএব, একজন মুসলিম উক্ত পাঁচটি উপাদানের প্রভাব এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত যাদু এবং তাবিজসমূহের কুসংস্কারকে বিশ্বাস করে না।

বরং ইসলাম বলে, এ সমস্ত যাদু জ্যামিতিক আকার, শক্তি পেন্ডুলাম এবং পাঁচটি উপাদানের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলো তৈরী বা চর্চা করা এবং এ যাদুগুলো উপকার করতে পারে অথবা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে- এ বিশ্বাস রাখা হচ্ছে শিরক এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার হাতে পিতলের একটি আংটি দেখতে পেলেন এবং তিনি বললেন: "এটি কি?" তিনি বললেন: এটি দুর্বলতার জন্য। তিনি বললেন: "এটি শুধুমাত্র তোমার দুর্বলতা বাড়াবে, তোমার কাছ থেকে তা ছুড়ে ফেলে দাও; কেননা যদি তা তোমার উপর থাকা অবস্থায় তুমি মারা যাও, তবে তোমাকে তার প্রতিই সোপর্দ করা হবে।"[৩৯]

অন্য একটি বর্ণনাতে রয়েছে: "যদি তুমি তা থাকা অবস্থায় মারা যাও, তবে তুমি কখনো সফল হতে পারবে না।" [৪০]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "যাদু চর্চা কোন উপকার করে অথবা কোন ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, [এ বিশ্বাস রাখা] এটি সম্পূর্ণ বড় শিরক।" [৪১]

এটি সেই একই বিশ্বাস, যা ভগবত গীতা (Bhagavad Gītā, भगवद्गीता) বলছে, যেখানে বলা হচ্ছে: "যারা একাধিক

প্রভুর পূজা করবে, তারা একাধিক প্রভু পাবে। যারা পূর্বপুরুষদের পূজা করবে, তারা পূর্বপুরুষদেরকে পাবে। যারা শয়তানের পূজা করবে, তারা শয়তানকে পাবে। আর যারা আমার পূজা করবে, তারা আমাকে পাবে।” [৪২]

সুতরাং যে ব্যক্তি এসব যাদু দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্ক গড়ে, সে গাইরুল্লাহর ইবাদাতকারী (পূজাকারী)।

বেদ অনুযায়ী তার স্থায়ী বাসস্থান হবে আগুন (নরক)। যজুর্বেদ বলে: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত তৈরীকৃত বস্তুসমূহকে পূজা করবে, সে যুগ যুগ ধরে অন্ধকারসমূহে নিমজ্জিত হবে আর আগুনের শাস্তি ভোগ করবে।” [৪৩]

আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহ বলেছেন:

﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [الرعد: 31]

“বরং যাবতীয় সকল বিষয় আল্লাহর জন্যই [এখতিয়ারভুক্ত]।” সূরা আর-র’দ, আয়াত: ৩১।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।” [৪৪]

অতএব, মুসলিম ব্যক্তি উক্ত পাঁচটি উপাদান, গ্রহমণ্ডলী, যাদুমন্ত্র এবং তাবিজের প্রভাবের পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বাস করে না; বরং সে বিশ্বাস করে যে এগুলো পৌত্তলিকতা, ভ্রষ্টতা, মিথ্যা এবং কুসংস্কার।

১০। হিন্দু সমাজের বাস্তব চিত্র কী?

হিন্দু সমাজ পুনর্জন্মের ধারণা এবং কর্মের ধারণায় বিশ্বাসের কারণে নিশ্চিতভাবে এটি একটি বর্ণবাদী সমাজ।

যেহেতু [এ বিশ্বাস মতে] অনাচারী ব্যক্তি পরের জন্মে আগের থেকে নিচু শ্রেণিতে জন্ম নেবে।

ফলতঃ দুঃখে-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তি তার প্রাপ্য কষ্টই ভোগ করে...

এটি দরিদ্র ও পীড়িতদের বিরুদ্ধে হংকারীদের সম্পূর্ণ নিপীড়ন এবং তাদের প্রতি উদাসীনতা। এটি হংকারীদের সাথে এক প্রকার নমনীয়তা প্রদর্শন করা।

হিন্দুধর্মে মানুষ চার শ্রেণিতে বিভক্ত:

- ১- ব্রাহ্মণ: শিক্ষক এবং পুরোহিত সম্প্রদায়।
- ২- ক্ষত্রিয়: যোদ্ধা এবং রাজ-রাজন্য সম্প্রদায়।
- ৩- বৈশ্য: কৃষক এবং বণিক সম্প্রদায়।
- ৪- শূদ্র: শ্রমিক সম্প্রদায়।

সর্বনিম্ন শ্রেণী হল: শূদ্র অস্পৃশ্য যারা অপবিত্র কর্মে লিপ্ত
- তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে - যেমন পরিচ্ছন্নতা এবং সেবা।

প্রতিটি ব্যক্তির শ্রেণী তার কাজের ধরণ, পোশাক এবং খাবার নির্ধারণ করে।

আর (তাদের) বিবাহ একই শ্রেণীতে হয়।

একজন ব্যক্তি যে শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেছিল, সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা তার আমৃত্যু বলবৎ থাকে।

এই শ্রেণী ধারণার উদ্ভব, যেমনটি আমি বলেছি, আত্মার স্থানান্তর বা পুনর্জন্মের মতবাদ এবং কর্ম-শাস্তি ও পুরস্কার-এর মতবাদের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। সুতরাং শূদ্র অস্পৃশ্যদের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য; কারণ সে অবশ্যই পূর্বজন্মে পাপী ছিল। তাই সে এই শ্রেণীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে।

এই বিকৃত ভ্রান্ত ধারণা সমগ্র জীবনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এই এ ধারণা থেকে আমরা বিবেচনা করতে পারি যে, অস্পৃশ্যদের সাহায্য করা কর্মের প্রতি এক ধরনের অসম্মান।

নিশ্চিতভাবেই এটা পশ্চাৎপদতা, অন্যায়, শ্রেণী বৈষম্য (বর্ণবাদ) ও সীমালঙ্ঘনের প্রতি এক ধরনের আপোশকামিতা।

পুনর্জন্মের দর্শন এবং কর্মের দর্শনের ফল হলো এই শ্রেণীবিন্যাস। আর এই ভ্রান্ত ধারণার ভুক্তভোগি হলো, কতক দরিদ্র, অসুস্থ, দুর্বল মানুষ যাদের হতে কিছুই নাই।

হিন্দুধর্ম তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার সুযোগ হারিয়ে ফেলছে।

হিন্দু ধর্মের এ দৃষ্টিভঙ্গি মানব স্বভাব ও মানবতার পরিপন্থী একটি দৃষ্টিভঙ্গি। মানবতা মানুষকে দুর্বল, অভাবী এবং অসুস্থদের প্রতি সহানুভূতির দিকে ধাবিত করে এবং তাদের প্রতি কর্তব্যবোধের কারণে তাদের সেবা প্রদান, এবং তাদের ক্ষতি ও দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করার প্রতি উৎসাহ দেয়।

আমি জানি না, হিন্দুরা কিভাবে বেদে লেখা শেষ দিবসের বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেল, যে বিশ্বাসের দ্বারা মানুষের জীবন সংশোধিত হয় এবং দুনিয়া সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধিত হয়। পরকালে আল্লাহর সামনে মানুষের হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক মানুষই নিষ্পাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে, আর দুঃখী মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ালে পরকালে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং, দুটির মধ্যে কোন দৃষ্টিভঙ্গিটি মানুষের জন্য উপযুক্ত এবং আরও উপকারী এবং তাদের স্বাভাবিক স্বভাবের কাছাকাছি?

কর্মের দর্শন (মতবাদ), নাকি বেদের বিশ্বাস?

ঋগবেদে এসেছে: “হে আল্লাহ (প্রভু), তুমি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সর্বোত্তম প্রতিদান দাও।” [৪৫]

ঋগবেদে আরো এসেছে: “আমাকে এমন স্থানে স্থায়ী করে দিন, যেখানে সকল প্রকার উপভোগ্য বস্তু ও আনন্দ পাওয়া যায়, আর যেখানে অন্তরসমূহ যা কামনা করে তাই দেওয়া হয়।” [৪৬]

এগুলোই হচ্ছে বেদের বিশ্বাস।

জান্নাতের (স্বর্গের) কথাও রয়েছে, যেখানে ধার্মিক বা ন্যায়পরায়ণদেরকে নিআমাত দেওয়া হবে।

এছাড়াও, বেদ অনুসারে, পাপীদের জন্য একটি যন্ত্রণার স্থান প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঋগবেদ বলে: “একটি চূড়ান্ত গভীর স্থান, পাপীদের জন্য, যার গহ্বর অনেক দূরে।” [৪৭]

তাহলে বারবার জন্ম ও আত্মার স্থানান্তরের ধারণার ভিত্তিতে এই স্থানগুলো কোথায়?

কর্মের দর্শনে পাপীদের গভীরতম সেই স্থান কোথায়?

সুতরাং সামগ্রিকভাবে কর্মের দর্শন বেদের চেতনার বিপরীত একটি মানবিক উদ্ভাবন ও ধারণা মাত্র।

সমস্ত নবীর বিশ্বাস ছিল: শেষ দিবস, স্বর্গ ও নরকে [জান্নাত ও জাহান্নামে] বিশ্বাস করা এবং মানুষ পাপ ছাড়াই নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে।

এটি সেই ধর্ম-বিশ্বাস, যা স্বভাব ও তা কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অন্যায়, পশ্চাদপদতা, শ্রেণীবৈষম্য ও সীমালঙ্ঘনের বিরোধী।

সুতরাং নবীদের ধর্ম মানুষকে উন্নত করতে চায় এবং মানুষকে সমান হিসেবে বিবেচনার প্রতি আহ্বান জানায়।

ইসলামে মানুষের মূল্য তার শ্রেণীতে, তার আকারে, তার স্বাস্থ্যের অবস্থাতে বা তার বস্তুগত স্তরের ভিত্তিতে নয়; বরং মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় তার ভালো কাজের ভিত্তিতে।

এছাড়াও ইসলাম বংশ ও সামাজিক মর্যাদা উপেক্ষা করে সকলকে উন্নত হওয়ার আহ্বান জানায়।

বরং দৃঢ়ভাবে অস্পৃশ্য ধারণা এবং সার্বিকভাবে শ্রেণীবৈষম্য চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করে।

মহিমান্বিত কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ [الحجرات:

[13

“হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমারা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।” সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বলেন: “যাকে তার আমল পিছিয়ে দেবে, তার বংশ পরিচয় তাকে অগ্রগামী করবে না।” [৪৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, লোকজন আমার নিকট তাদের আমল নিয়ে আসবে না; অথচ তোমরা আসবে তোমাদের বংশ পরিচয় নিয়ে?” [৪৯]

সুতরাং ইসলামে বংশের কোন মূল্য বা ওঘন নেই।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “হে মানুষেরা! নিশ্চয় তোমাদের রব একজন, আরব ব্যক্তির উপর অনারব ব্যক্তির এবং অনারব ব্যক্তির উপর আরব ব্যক্তির, কালোবর্ণের উপর সাদাবর্ণের এবং সাদাবর্ণের উপর কালোবর্ণের একমাত্র তাকওয়া ছাড়া অন্য কোন

মর্যাদা নেই।" [৫০] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: "তোমরা আমার কাছে দুর্বলদেরকে খুঁজে নিয়ে আস; কেননা তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমেই তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হয় এবং সাহায্য করা হয়।" [৫১]

সুতরাং "তোমরা আমার কাছে দুর্বলদেরকে খুঁজে নিয়ে আস; কেননা তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমেই তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হয় এবং সাহায্য করা হয়।" এ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দুর্বলদের ব্যাপারে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে দেখুন।

মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে গরীব, দুর্বল, সরল এবং নির্বোধ মানুষের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের জন্য। এই স্বভাবজাত স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রতি বর্তমান হিন্দুধর্মের বিরোধিতা একটি বাস্তব সমস্যা।

১১। হিন্দুরা কি কার্যতই গরুকে পবিত্র মনে করেন?

হাদিয়া ও উৎসর্গ প্রদানের উৎস হিসেবে হিন্দুধর্মে গরুর একটি বিশেষ পবিত্র অবস্থান রয়েছে। আরেকটি বিষয় হল, আধুনিক যুগের হিন্দুরা মনে করেন যে, প্রভু তাঁর সৃষ্টি করা প্রাণীদের মধ্যে বাস করেন, যার মধ্যে গরুও রয়েছে, যা সর্বেশ্বরবাদ তথা 'অস্তিত্বের একাত্মতা' দর্শন নামে পরিচিত। সুতরাং, হিন্দুধর্মে গরুর পবিত্রতার বিষয়ে বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত গরুকে কেন্দ্র করে বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। [৫২]

এর বিপরীতে, বেদসমূহ সমস্ত বস্তুজগত এবং সমস্ত প্রাণীজগতের উপরে আল্লাহর (প্রভুর) পবিত্রতা এবং প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি মাখলুকের ওপর তা মহত্ব তুলে ধরেছেন।

ঋগবেদে বলা হয়েছে: "আমিই আল্লাহ (প্রভু), যিনি সবকিছুর আগে বিরাজমান, এবং আমি সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক, এবং আমিই প্রকৃত অনুগ্রহকর্তা এবং সমস্ত অনুকম্পার পরম বাছাইকারী। তাই, সমস্ত আত্মার উচিত

আমাকেই সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ডাকা উচিত।”[৫৩]

এটি সূর্যের মতো একটি স্পষ্ট বর্ণনা, যা অস্তিত্বের একাত্মতার ধারণাকে নাকচ করে। সুতরাং আল্লাহ (প্রভু), তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা এবং বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এছাড়াও এ বর্ণনাটিতে বস্তুজগতকে পবিত্র মনে করা বা সৃষ্টবস্তুদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার বিরুদ্ধে একটি হুশিয়ারী রয়েছে, আর তাই, গরুর স্রষ্টা এবং সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছেই সাহায্য চাওয়া যাবে না।

আর শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মতবাদই ইসলামী মতবাদের মূলকথা।

ইসলাম বলে যে, গরু এবং আমাদের চারপাশের সমস্ত বস্তুজগতের উপাদান আমাদের অধীন, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ [الجاثية: 13]

“আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে,

নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।” সূরা আল-জাছিয়াহ: ১৩।

এটাই ইসলামের বিশ্বাস, যা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

হিন্দুরা কখনোই বেদে বর্ণিত তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ইসলাম কবুল করা ছাড়া ফিরে যেতে পারবে না। সুতরাং ইসলামই হচ্ছে বেদে বিদ্যমান সত্যকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী। আর ইসলামই মানুষের সব ভ্রান্তিগুলো শুধরে দেয় এবং মানুষের ঐশ্বরিক আদেশ (অহী)-এর সব বিচ্যুতিসমূহ দূর করে দেয়।

১২। কিন্তু হিন্দুধর্মে প্রচুর পরিমাণে অবাধ্যতা পরিহার করা এবং পাপ থেকে দূরে থাকার প্রচেষ্টা রয়েছে, এটি কি একটি প্রার্থক্য নির্ধারণকারী বৈশিষ্ট্য নয়?

আমি পূর্বেই হিন্দুধর্মে অত্যধিক কঠোরতার বিষয়টি ইঙ্গিত করেছি। তবে আমি এখানে যা বলতে চাই তা হল: পাপের অনুশোচনা এবং অন্তরের যন্ত্রনা একটি প্রাকৃতিক বিষয়, যা ইলাহী বাধ্যবাধকতার সাথে জড়িত।

যেহেতু আমরা আদিষ্ট, তাই যে কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় আমরা অন্তরে কষ্ট অনুভব করি।

এটিই ফিতরাত (সহজাতপ্রকৃতি)। মহিমাশ্রিত কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الرُّوم: 30]

“আল্লাহর সহজাতপ্রকৃতি, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।” সূরা আর-রুম, আয়াত: ৩০।

এই সহজাতপ্রকৃতি সামনে, একজন ব্যক্তি কল্যাণ এবং সত্যের প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী যে অন্যায়ের সাথে বিবেকের দংশন অনুভব করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ চূড়ান্ত বার্তা -ইসলামে- কল্যাণ ও সত্যের মূল্যবোধ লঙ্ঘন থেকে ক্ষমা চাওয়ার এবং তাওয়ার নির্দেশ করেছেন। এছাড়াও আল্লাহ অন্যায়পূর্বক অর্জিত বিষয়গুলোকে তার মালিককে ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন, আর এ দ্বারা আল্লাহ পাপ ক্ষমা করেন।

অন্যদিকে হিন্দুধর্মে, আমরা পাপকে প্রতিরোধ করার জন্য ভিন্ন একটি পদ্ধতি খুঁজে পাই, তা হল: কিছু অভ্যাস, চিন্তাভাবনা, এবং স্থির আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নিজের আত্মার উপরে অত্যাধিক কঠোরতা আরোপ করা, যাতে একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বাক্যহীন হয়ে পড়ে।

১৩। কিন্তু হিন্দুধর্মে থাকা সম্পূর্ণ চুপ থাকা এবং ধ্যানের উপবেশন এ সবকি ভাল জিনিস?

হিন্দুধর্মে বিদ্যমান ধ্যান যেমন যোগাসনে যা ঘটে, যা পরবর্তী যুগে 'প্রাণ' (Prana) সাধনার দর্শনের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল: এটি আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ ও তাঁর প্রজ্ঞা বিষয়ক কোন চিন্তা নয়, আবার তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি ও নেয়ামতের বিষয়েও ধ্যান বা চিন্তা করা নয়।

বরং তাদের জন্য ধ্যান হল এক প্রকার সম্পূর্ণ নীরবতা (শান্ত হওয়া) এবং মনকে যে কোন বিক্ষিপ্ত বা নিরর্থক চিন্তা থেকে শূন্য করা।

এটি মৃত্যুর ন্যায় একটি সম্পূর্ণ নিস্তন্ধতা, যেখানে মনকে চিন্তা করা থেকে বিরত রাখা হয় (Silence your Mind During Yoga)।

এই অদ্ভুত স্থির ধ্যানের উপবেশনগুলি, যা বেদ পরবর্তী যুগে আবির্ভূত হয়ে তাদের চিন্তাভাবনার উপরে প্রভাব ফেলেছিল, হ্যালুসিনেশন এবং ভ্রান্ত ধারণা তৈরী করতে শুরু করেছিল এবং শয়তানরা তাদের জ্ঞানজগতে খেল তামাশা শুরু করেছিল।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে, সে (ঐশ্বরিক) জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছে। অথচ তার সাথে যা ঘটেছে, তা হচ্ছে না খাওয়া এবং সম্পূর্ণ নীরবতার পাশাপাশি মস্তিষ্কের আয়নসমূহের ভারসাম্যহীনতার ফলে ঘটিত হ্যালুসিনেশন ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমনটি আমি আগে ব্যাখ্যা করেছি। [৫৪]

সুতরাং দীর্ঘ স্থির ধ্যান এবং চরম ক্ষুধা এই ধরনের হ্যালুসিনেশনের দিকে পরিচালিত করে, বিশ্বের স্থির ধ্যান (static meditation) সংক্রান্ত স্কুলসমূহের অন্যতম বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা মিকাও উসুই (Mikao Usui) এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

এমনকি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার ক্ষুধা ও বঞ্চনার পরে চেতনা হারাতে শুরু করেছিলেন এবং হ্যালুসিনেট করতে শুরু করেছিলেন এবং এই মুহূর্তে তার চিন্তাভাবনা উদ্ভিত হতে শুরু করেছিল [৫৫]।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডোনোভান রক্লিফ (Donovan Rawcliffe) একটি পৃথক গবেষণায় নিশ্চিত করেছেন যে, এ জাতীয় অনুশীলনের ফলে উদ্ভূত চিন্তাভাবনাগুলি ও হ্যালুসিনেশনের কারণে সৃষ্ট অসুস্থ বিভ্রান্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। [৫৬]

উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও, বেশিরভাগ যোগব্যায়াম উপবেশনগুলি স্বাস্থ্যের জন্য ক্রটিপূর্ণ এবং তাতে অভ্যস্ত হওয়া বিভ্রান্তি, বিভ্রম এবং স্থান ও সময়ের অনুভূতি হারানোর দিকে ধাবিত করে থাকে। আর এটি স্মৃতিশক্তিকে দুর্বল করে এবং আলঝেইমারকে ত্বরান্বিত করে। [৫৭]

হিন্দুধর্ম এই অনুশীলনগুলির মাধ্যমে বেদ এবং নবীদের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে।

ইসলাম আল্লাহর সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা, ধ্যান ও গবেষণা করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং এটা হচ্ছে এমন এক চিন্তা, ধ্যান ও গবেষণা যা আমল, আনুগত্য, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং জীবনে অধ্যাবসায়ের দিকে ধাবিত করে, এটি নিরবতা ও চিন্তাকে বন্ধ রাখা নয় যার পরিণতি স্থিরতা।

প্রকৃত চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, যা আনুগত্য ও আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশের দিকে ধাবিত করে।

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 191]

“যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে, আর বলে, ‘হে আমাদের রব! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি

করেননি, আপনি অত্যন্ত পবিত্র, অতএব আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।' সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯১।

এটি হচ্ছে সেই ধ্যান বা চিন্তা-ভাবনা, যা ইসলাম নিয়ে এসেছে এবং এটি মানুষের সহজাত প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং একজন ব্যক্তিকে তার চারপাশে পরিবেষ্টিত আল্লাহর নিয়ামাতসমূহের জন্য কৃতজ্ঞ হতে এবং এই নিয়ামাতগুলোর ব্যাপারে গবেষণা করতে সহায়তা করে।

বর্তমান হিন্দুধর্মে সম্পূর্ণ স্থিরতার জন্য পালনীয় উপবেশনগুলো হল শয়তানের বিশ্রামের স্থান। যেখানে শয়তানরা এ সমস্ত লোকদেরকে এ ধরণের ধ্যানে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কিছু সহায়তা, অন্তর্দৃষ্টি ও কিছু সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করে থাকে। তখন তাদের অন্তরসমূহে বারবার জন্ম নেওয়া, আত্মার স্থানান্তর হওয়া, অস্তিত্বের একাত্মতা, প্রভু কর্তৃক মূর্তির মধ্যে শারীরিকভাবে প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদির ধারণা জন্ম নেয়। তারপরে এ সমস্ত সন্ন্যাসীরা তাদের অনুসারীদের মধ্যে এসব ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষার অবতারণা ঘটায়। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে ফেলে।

১৪। বর্তমান হিন্দুধর্মে যেমনটি রয়েছে, নির্জন প্রান্তরে জন বিচ্ছিন্ন হওয় তাতে সমস্যা কী?

হিন্দুধর্ম প্রবৃত্তি এবং লালসার বিরোধিতা করে, তবে তা আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য নয়, যেমনটি ইসলামে তা করা হয়; বরং তা করা হয়ে শরীরকে পুড়িয়ে ধ্বংস করার জন্য। সুতরাং বর্তমান হিন্দুধর্ম মানুষকে বৈরাগ্যতা ও দুনিয়া বিমুখতার দিকে টানে।

এমনকি হিন্দুধর্ম দেখে যে, প্রবৃত্তিকে ভুলে যাওয়া দেহকে ভুলে থাকার মাধ্যমে ঘটে।

সুতরাং যে হিন্দু ব্যক্তি 'মোক্ষ' অর্জন করতে চায়, সে নির্জনে চলে যায়, যাতে তার দেহ সেখানে পবিত্র থাকে। আর আমৃত্যু সে ভিক্ষুক হয়ে কাটাতে পারে।

এটি একটি ভয়াবহ ভারসাম্যহীনতা ও ক্ষতি যা মানুবজাতি, পরিবার এবং সমাজকে ধ্বংস করে।

পরিবার গঠন, সমাজ বিনির্মাণ, চেষ্টা-সাধনা এবং জীবন গড়ার জন্য মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তি ও লালসা এক ঐশ্বরিক দান।

প্রবৃত্তির চিকিত্সা করা হবে তার সংশোধন ও যথাযথ প্রাকৃতিক ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে। আমাদের শরীরকে পুড়িয়ে ফেলার মাধ্যমে নয়।

সুতরাং কে এ কথা বলেছিল: আমাদের অস্তিত্বের পরিণতি হল একমুঠো খাবারের জন্য ভিক্ষা করা। তারপর আমরা আমৃত্যু- বাকি দিনগুলো জঙ্গলে কাটাবো?

আর কে বলেছে যে, আমরা এক টুকরা জাফরানী কাপড় পরার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছি এবং তারপর আমৃত্যু পৃথিবী থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখব?

সর্বনিম্ন পোকামাকড়গুলোও অস্তিত্বের দায়িত্ব পালন, জমিন আবাদ করা এবং জীবন সংস্কার সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি রক্ষণশীল। তুমি দেখতে পাবে, মৌমাছির ঝাঁক তাদের নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের মঙ্গলের জন্য প্রচেষ্টা এবং শৃংখলা রক্ষায় কাজ করে। তুমি আরো দেখতে পাবে যে, অল্পে থাকা ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়াও নিজেদের এবং অপরের উপকার সাধন করে।

আর সামগ্রিকভাবে জীবন চলে নিয়ম এবং কাজের মধ্য দিয়ে।

বর্তমান হিন্দুধর্ম অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং ভিক্ষাবৃত্তিকের দিকে আহ্বান করে। নিশ্চয় হিন্দুধর্ম অনুসারে ভিক্ষাবৃত্তি জীবন বিধান হয়ে পড়েছে।

এখানে প্রশ্ন হল: একজন হিন্দু ব্যক্তি লোকালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাহাড়ের চূড়া এবং নির্জন প্রান্তরে আশ্রয় নেওয়ার অর্থ কী হতে পারে? আর এটি মানুষের ওপর কী ধরণের উপকার ভয়ে আনতে পারে?

প্রকৃত ধর্ম ও সঠিক জীবন বিধান হল কঠোর পরিশ্রম, উপদেশ এবং মানুষের সাথে মেলামেশা করা, তাদের সংস্কার করা এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা। তাদের কাছ থেকে উপত্যকা এবং মরুভূমিতে পালিয়ে যাওয়া না!

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যার অর্থ: "ঐ মুসলিম যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে, আর তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে সে ঐ মুসলিম অপেক্ষা উত্তম যে, মানুষের সাথে মেলামেশা করে না আর তাদের দেওয়া কষ্টেও ধৈর্য ধারণ করে না।" [৫৮]

১৫। লালসা প্রতিরোধ এবং পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় কী?

সহজাত প্রবৃত্তি ও লালসা প্রতিরোধের মূল হচ্ছে স্বভাবজাত ও ধর্মীয় নির্দেশিত পদ্ধতি। আর মুসলিম ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য যে, সে যেভাবে ইলাহী অহী (ঐশী বাণী) আদেশ করেছে ঠিক অনুরূপ পদ্ধতিতে লালসাকে পরিশীলিত করবে।

যার মধ্যে রয়েছে: বৈধ বিবাহ, চোখ অবনমিত করা, আরো রয়েছে: প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা, আরো রয়েছে: পাপে লিপ্ত হলে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সতর্কতা।

আবার মানুষ যখন ভুল করে ও তার আত্মা দুর্বল হয়, তার জন্য তাওবার পদ্ধতিও রয়েছে।

কিন্তু হিন্দুধর্মে, আমরা একজন হিন্দু ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যে 'মোক্ষ' অর্জন করতে চায়, সে তার স্ত্রী, সন্তান এবং পেশা ছেড়ে পথেঘাটে এবং নির্জন (পরিত্যক্ত) স্থানে ঘুমায়, তার খাবারের জন্য ভিক্ষা করে, এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এইভাবে তার দেহ পোড়াতে থাকে। এটা কী নিজেকে পরিশীলিত করার কোন সঠিক উপায়?

হিন্দু সন্ন্যাসীরা, যাদের সংখ্যা আজ ভারতে ৫০ লক্ষ ছাড়িয়েছে, তারা কেবল তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের ধ্বংস করে ক্ষান্ত হয় না; বরং তারা নিজেরাই তাদের খাওয়ানো এবং যত্ন নেওয়ার জন্য অন্যদের প্রতি মুখাপেক্ষি।

ইসলাম মানব আত্মাকে সর্বোত্তম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করেছে।

যাদের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে ত্রুটিকে ইসলাম অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: [যার অর্থ] "মানুষের গুনাহের জন্য এতটুকু যথেষ্ট, সে যাদের ভরণপোষণ করে তাদের হক নষ্ট করে।" [৫৯]

অতপর ইসলাম সিদ্ধান্ত দিয়েছে, দুনিয়া পরিত্যাগ না করে সংকাজ এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে আত্মার সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করবে। ইসলামে একজন ব্যক্তিকে হিন্দুধর্মের মত এভাবে দেহকে কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন ছাড়াই তার সমাজে বসবাস, সমাজ বিনির্মাণ এবং একই সময়ে সে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ পেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَيَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

[النازعات: 40-41]

“আর যে তার রবের অবস্থানকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে। সুতরাং জান্নাতই তার আবাসস্থল।” সূরা আন-নাযি‘আত, আয়াত: ৪০-৪১।

সুতরাং আল্লাহকে ভয় করা এবং সৎকাজ করাই হচ্ছে জান্নাতের পথ। যদিও তুমি কোন অট্টালিকাতে বাস কর।

সুতরাং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা শরীরকে পোড়ানো বা বিনষ্ট করাকে আবশ্যিক করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۗ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۗ فَكُ رَقَبَةٍ ۗ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ

ذِي مَسْعَبَةٍ ۗ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۗ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۗ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۗ﴾ [البلد: 11-18]

“তবে সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি।” (১১) আর কিসে আপনাকে জানাবে--- বন্ধুর গিরিপথ কী?” (১২) “এটা হচ্ছে দাস মুক্ত করা। (১৩) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান করা। (১৪) ইয়াতীম আত্মীয়কে। (১৫) অথবা দারিদ্র-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে। (১৬) তারপরে সে

তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যারা ঈমান এনেছে, আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে ধৈর্য্য ধারণের, আরো পরস্পর উপদেশ দিয়েছে দয়া-অনুগ্রহের। (১৭) তারাই সৌভাগ্যশীল। (১৮)” সূরা আল-বালাদ, আয়াত: ১১-১৮।

সুতরাং যতক্ষণ না তুমি জান্নাত লাভে ধৈর্য্য না হবে, তোমার দায়িত্ব হলো, দাস মুক্ত করবে, গরীবদের খাওয়াবে, উত্তম কাজ করবে আর মানুষকে উত্তম কাজের উপদেশ দেবে।

এভাবে তুমি নাজাত পাবে।

তুমি এভাবে পরিত্রাণ পাবে না যে, তুমি মানুষ থেকে দূরে থেকে তোমার বাকী জীবন ভিক্ষা করে কাটিয়ে দিবে।

১৬। ইসলাম কেন হিন্দুধর্মকে নাকচ করে?

বর্তমান হিন্দুধর্ম, এটি কোন ধর্ম, মতবাদ অথবা ধর্ম-বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গিও নয়। বরং এটি সন্ন্যাসীদের দর্শন, শিক্ষা, গুপ্ত তন্ত্র এবং অগণিত আচার-সাধনার সাথে বেদের সংমিশ্রণে তৈরী একটি জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে।

অতএব, হিন্দুধর্ম কোন একক ধর্মতাত্ত্বিক উপাসনা পদ্ধতি অথবা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের আচার-সাধনা, অথবা কোন ধর্মীয় অবিচল ব্যবস্থা, অথবা কেন্দ্রীয়ভাবে হিন্দুদেরকে একত্রিত করতে পারে এমন কোন কাঠামোও নয়। তুমি কখনোই সেখানে এমন কিছু পাবে না; বরং আক্ষরিকভাবে তুমি হাজার হাজার সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ধর্মীয় দলের সামনে নিজেকে খুঁজে পাবে! [৬০]

সুতরাং কিভাবে এমন বিকৃত কোন কিছুর দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত করা যেতে পারে, যার ব্যাপারে তিনি কোন প্রমাণ অবতরণ করেননি?

এবং কিভাবে ধারণার এমন বিকৃত সংমিশ্রণকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে?

এছাড়াও আধুনিক যুগের হিন্দুরা কিভাবে মূর্তিসমূহকে আল্লাহর শারীরিক প্রকাশ হিসেবে ধরে নিয়েছে তা চিন্তা করে দেখা!

যারা মূর্তিসমূহকে তাঁর শারীরিক প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম গণ্য করে, তাদেরকে মহাশক্তিধর আল্লাহ তাদের কাফের বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহ বলেছেন:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: 3]

“জেনে রাখুন, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবো।' তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে সে ব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না।” সূরা আয-যুমার: ৩।

এবং হিন্দুরা, এই মূর্তিগুলি গ্রহণ করে - আমি আগে যেমন ব্যাখ্যা করেছি- বেদের বিরোধিতা করেছে, এবং তারা তাদের সহজাত প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করেছে; কারণ তারা জানে তারা তাদের মূর্তিগুলিকে যেভাবে আল্লাহর শারীরিক প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করেছে, এ মর্মে তাদের কাছে সহজাত কোন প্রমাণ নেই।

﴿أَمَّنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَءَلَّهُ مَعَ اللَّهِ

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ [النمل: 64]

“নাকি তিনি, যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিষিক দান করেন, আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? বলুন, “তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।” সূরা আন-নামল: ৬৪।

আর কোথায় তাদের প্রমাণ!

আর কোথায় তাদের প্রমাণ!

সুতরাং বর্তমান হিন্দুধর্মের সমস্যা হল এটি পৌত্তলিকতাকে অতিরঞ্জিত করে এবং একে ধর্মের একটি স্তম্ভে পরিণত করে।

ফলত সবখানে শুধুই মূর্তি।

আর প্রভু মূর্তির মধ্যে কার্যিকভাবে প্রকাশিত।

এবং হিন্দুধর্মে হাজার হাজার মূর্তি, ছবি এবং প্রতিমা রয়েছে।

তাই হিন্দুধর্ম মূর্তি, ভাস্কর্য ও প্রতিমাসমূহের ধর্মে পরিণত হয়েছে।

এছাড়াও বর্তমান হিন্দুধর্ম অস্তিত্বের একাত্মতার মতবাদের কথা বলে।

বর্তমান হিন্দুধর্ম জগতকে অবিনশ্বর বলে থাকে।

এছাড়াও এটি শ্রেণিবৈষম্য প্রতিষ্ঠা করে।

বর্তমান হিন্দুধর্ম মানুষের মধ্যে প্রভুর শারীরিক প্রকাশকে "অবতার" বলে আখ্যা দেয়।

এবং মূর্তি ও প্রতিমার মধ্যে প্রভুর শারীরিক প্রকাশকে "শক্তি" বলে আখ্যা দেয়।

আর বর্তমান হিন্দুধর্ম আত্মার স্থানান্তরের কথা বলে।

বারবার জন্ম নেওয়ার কথা বলে।

এটি পাঁচটি উপাদানসহ এর অনুগামী যাদুবিদ্যা, তাবিজ এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কথা বলে।

এই সমস্ত কিছুর জন্যই মূলত ইসলাম হিন্দুধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এটি নবীদের শিক্ষাসমূহের লঙ্ঘন করেছে এবং তাওহীদকে ভুলে গেছে।

ইসলাম প্রতিটি হিন্দুকে ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফিরে আসারে আহ্বান জানায়; কারণ অন্যথায় আল্লাহর নিকটে তাদের কোন পরিত্রাণের উপায় থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْئًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: 19]

“নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম।” সূরা আলে ইমরান: ১৯।

তিনি আরো বলেন:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85]

“আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” সূরা আলে ইমরান: ৮৫। তিনি আরো বলেন:

﴿حَرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَفَةَ وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالطَّيْحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳﴾﴾ [المائدة: 3]

“আজকের দিন আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করছি। আর তোমাদের ওপর আমার নিআমতকে সম্পন্ন করছি। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনিত করছি।” সূরা আল-মায়িদাহ: ০৩।

সুতরাং কোন হিন্দু অথবা অন্য যে কোন মানুষের এই দীন (ধর্ম) - ইসলাম- ছাড়া পরিভ্রান নেই।

ইসলাম পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পরিগণিত কোন ধর্ম নয়, বরং এটি একমাত্র তাওহীদবাদী ধর্ম, যার দাওয়াত

সহকারে আল্লাহ সমস্ত নবীকে পাঠিয়েছেন। সকল নবীই এসেছেন মানুষকে তাওহীদের দিকে আহবান জানাতে। আর এ বিশুদ্ধ তাওহীদের উপরে আজ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ অবশিষ্ট নেই, যখন বাকি ধর্মে শিরক (বহু-ঈশ্বরবাদ)-এর একটি অংশ রয়েছে, তা অল্প হোক বা অনেক।

ইসলাম হচ্ছে- অন্যদেরকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁর আদেশসমূহ পালন করা, তাঁর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করা, তাঁর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা, অতীতে ঘটিত ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য যা কিছু সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, আর সকল ধরণের মূর্তি, প্রতিমা ও প্রতিকৃতি থেকে মুক্ত থাকার নাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصفات: 180]

“তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী।” সূরা আস-সফফাত: ১৮০।

মূর্তিসমূহের মধ্যে আল্লাহর শারীরিক প্রকাশ ঘটার ব্যাপারে হিন্দুরা যা বলেছে, তা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: 181]

“আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি!” সূরা আস-সফফাত: ১৮১।

নবীদের উপরে সালাম (শান্তি), যারা মানুষকে তাদের রবের ব্যাপারে পরিচিত করিয়েছেন, তাঁকে সব ধরনের মর্যাদাহানিকর বিষয় থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন।

১৭। প্রতিটি হিন্দু ব্যক্তির কেন ইসলামকে গ্রহণ করা উচিত?

একদিকে ইসলাম হচ্ছে সেই দীন ব্যবস্থা, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য সন্তুষ্ট হয়েছেন, এটিই হচ্ছে সেই ইলাহী শরীআত (চলার পথ), যা ছাড়া আল্লাহ অন্য কোন কিছু গ্রহণ করবেন না। আবার অন্যদিকে, হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহ, যার সম্ভবত কিছু ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অবশিষ্টাংশ এখনো রয়েছে, ইসলামের আগমন এবং ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অসংখ্য সুসংবাদ দিয়েছে। হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণ করার এবং বিচার দিবসে আল্লাহর কাছে তার মুক্তির একমাত্র পথটি নির্দিষ্টায় অনুসরণ করার ক্ষেত্রে এটি একটি শক্তিশালী কারণ।

আমি হিন্দুধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থসমূহ থেকে ইসলামের ব্যাপারে কতিপয় সুসংবাদ উল্লেখ করব।

কিন্তু হিন্দুদের বইয়ের সুসংবাদে প্রবেশ করার আগে, আমি উল্লেখ করতে চাই: হিন্দু আইনের অবস্থা এবং হিন্দু কীভাবে শুদ্ধ হওয়ার জন্য তার দেহ পোড়ায়।

এবং কিভাবে হিন্দুরা অপ্ৰাকৃতিক তপস্যা সাধনা করে থাকে।

আর পরিস্থিতি আহলে কিতাবদের থেকে খুব বেশি দূরে নয়; কারণ আহলে কিতাব, বিশেষ করে ইহুদিদের উপরেও পবিত্রতা এবং খাদ্যদ্রব্যে কঠোর বিধি-নিষেধের অসংখ্য বেড়ী ছিল এবং তাদের অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতির কারণে তাদের উপর আরোপিত আইনেরও বিশেষ শৃঙ্খল ছিল অত্যন্ত কঠোর।

মহিমান্বিত কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলছেন:

﴿فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ

سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [النساء: 160]

“সুতরাং ভাল ভাল যা ইয়াহুদীদের জন্য হালাল ছিল, আমরা তা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তাদের যুলুমের জন্য এবং তাদের আল্লাহর পথ থেকে অনেককে বাঁধা দেওয়ার জন্য।” সূরা আন-নিসা: ১৬০।

[এটা জানার ক্ষেত্রে] তোমার জন্য তাওরাতের [বর্তমানে পুরাতন নিয়মের] লেবীয় পুস্তক পাঠ করা যথেষ্ট হবে, যেখানে ইয়াহুদী নারীদের উপরে হায়েজের বিধান রয়েছে। তাওরাত বলছে:

“আর অশৌচকালে যে সব শয্যায় শয়ন করে, যার উপরে বসে তা অপবিত্র হয়ে যায়। আর যে তার বিছানা স্পর্শ করে, সে অবশ্যই তার কাপড় ধুইবে, পানি দ্বারা গোসল

করবে। সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে। আর যে তার বসার বস্তু স্পর্শ করে, সে অবশ্যই তার কাপড় ধুইবে, পানি দ্বারা গোসল করবে। সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে। আর তাহার শয্যার কিম্বা আসনের উপরে কোন কিছু থাকিলে যে কেহ তাহা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে। আর অশৌচকালে যে পুরুষ তাহার সাথে শয়ন করে, ও তাহার রজঃ তাহার গাত্রে লাগে, সে সাত দিবস অশুচি থাকিবে; এবং যে কোন শয্যায় সে শয়ন করিবে, তাহাও অশুচি হইবে।" [৬১]

বনী ইসরায়েলের অন্তরসমূহ কঠিন এবং শক্ত হওয়ার কারণেই এই কঠোর হুকুমসমূহ তাদের দেওয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তাওরাতে তাদেরকে বলেছিলেন, তিনি একজন নবী পাঠাবেন, যিনি তাদের কাছ থেকে এই সমস্ত শৃঙ্খল তুলে নেবেন।

তাওরাত আমাদের জন্য বর্ণনা করে, নবী ইয়াকুব (আঃ) মৃত্যুর সময়, তিনি তার বারোজন পুত্রকে একত্রিত করেছিলেন এবং তাদের উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন, তাওরাতে ইয়াকুবের প্রসিদ্ধ উপদেশের মধ্যে যা রয়েছে। তাওরাত বলেছে:

"পরে যাকোব [ইয়াকুব] আপন পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা একত্র হও, উত্তর কালে তোমাদের প্রতি

যাহা ঘটিবে, তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি। যাকোবের পুত্রগণ, সমবেত হও, শুন, তোমাদের পিতা ইস্রায়েলের বাক্য শুন।

...

তারপরে তিনি যিহূদা (এহূদা)-কে বললেন, আর যিহূদা হচ্ছে নবীগণের পূর্বপুরুষ: [যাদের মধ্যে রয়েছেন] দাউদ, সুলাইমান ও মাসীহ (ঈসা) আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম।

তিনি তাকে বলেছিলেন:

“যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে বিচারদণ্ড যাইবে না, যে পর্যন্ত শীলো না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই আজ্ঞাবহতা স্বীকার করিবে।”

[৬২]

আহলে কিতাবদের মধ্যে কোন ধরনের বিতর্ক ছাড়াই এ উদ্ধৃত অংশটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ধরনের সুসংবাদ বটে!

সুতরাং এটি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে সুসংবাদ বহন করছে, যার কাছে অচিরেই নবুয়ত স্থানান্তর করা হবে আর তার কাছে হুকুম ও শরী'আতের দায়িত্বও অর্পন করা হবে।

“যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না”: রাজদণ্ড হল ক্ষমতা বা বিচারের লাঠি। এর অর্থ হল: যিহূদার বংশধরদের মধ্যে অসংখ্য বিচারক নবীগণ আসবেন।

“যে পর্যন্ত শীলো না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই আঞ্জাবহতা স্বীকার করিবে।”

সুতরাং কে সেই শীলো? যাকে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নবী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং জাতি যার আঞ্জাবহতা স্বীকার করবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, বনী ইসরাঈলের শেষ নবী ছিলেন মাসীহ আলাইহিস সালাম এবং তিনি ছিলেন এহুদা (যিহূদা)-র বংশধর।

তারপর বনী ইসরাঈলের মধ্যে আকস্মিকভাবে নবীদের আগমন বন্ধ হয়ে যায়!

আর ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে বাণী বন্ধ হওয়ার পর শাসন, নবুয়ত ও শরী'আত যিহূদার বাইরে থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে মেনে নেওয়া হয়, তাই না?

এটা স্পষ্ট যে, এ ব্যক্তি মাসীহ আলাইহিস সালাম নন; কেননা মাসীহ এহুদা বা যিহূদার বংশধর ছিলেন!

এবং ইয়াকুবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই ব্যক্তির উম্মাত বা জাতী যিহূদার ভূমি দখল করবে, যিহূদা হইতে রাজদণ্ড এবং চরণযুগলের মধ্য হইতে বিচারদণ্ড যাইবে না, যে পর্যন্ত শীলো না আইসেন; ফলে তার জন্যই হবে আনুগত্য ও আজ্ঞাবহতা।" তাই অচিরেই এই আসন্ন নবীর উম্মাত (স্বীয় জাতি) ভূমি ও ফিলিস্তিন দখল করবে, বড় বড় সাম্রাজ্যগুলো তার উম্মাতের অনুগত হয়ে যাবে।

আর খলিফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তার খিলাফতকালে যিহূদার ভূমি দখল করেন এবং শাম (সিরিয়া, জর্ডান), ইরাক ও পারস্য ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

এই বাস্তবতা বোঝার জন্য খুব বেশী লেখা বা চিন্তার প্রয়োজন হয় না!

তাহলে ইতিহাস আমাদের বলে যে, যাকোব (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) তার পুত্রদের উদ্দেশ্যে করা ওসীয়াতের মধ্যে যে নবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। আর এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি এবং এটি বিস্তারিতভাবে তার জাতি (মুসলিম) ছাড়া অন্য কোন জাতির ক্ষেত্রেও ঘটেনি।

কিন্তু 'শীলো' শব্দের অর্থ কী?

শীলো অর্থ: বিশ্রামদাতা অথবা শৃংখল থেকে মুক্তকারী (Rest-giver); এ অর্থটি অধিকাংশ ওল্ড টেস্টামেন্টের বিশেষায়িত গবেষণা ওয়েবসাইটগুলোতে গ্রহণ করা হয়েছে। [৬৩]

সুতরাং ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদেরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছিলেন, যিনি তাদের থেকে শৃংখলাবদ্ধতা ও বিধি-নিষেধসমূহ তুলে দেবেন।

এখন আমরা আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পড়ব:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾
[الأعراف: 157]

“যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে।” সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭।

“আর তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল।”: ইসলামের সহনশীল ও সহজ শরীআত এই সমস্ত শৃংখল ও বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে।

এবার আসা যাক হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের দিকে। [৬৪]

হিন্দুধর্ম, যেমন আমি উল্লেখ করেছি, পাপ থেকে পবিত্র করার জন্য কামনা-লালসাকে পোড়ানোর জন্য কঠিন আচার-অনুষ্ঠানে ভরপুর।

সুতরাং হিন্দুদের বইগুলো এমন একজন মহান নবীর বর্ণনা দিচ্ছেন, যিনি তাদের বোঝা থেকে মুক্তি দেবেন এবং তাদের পাপ থেকে তাদের পবিত্র করবেন।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলে: "মধু মাসের চাঁদের দ্বাদশ তারিখে কঙ্কি জন্মগ্রহণ করবেন।"[৬৫]

আর কঙ্কি অর্থ: পাপসমূহ থেকে পবিত্রকারী।

এবং মধু মাস: এটি বসন্তের মাস, যা আত্মাসমূহের পছন্দনীয়।

সুতরাং সেই আগমনী নবী, যিনি তাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করবেন, তিনি বসন্ত মাসের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করবেন।

আর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেমনটি বেশিরভাগ মুসলিম পণ্ডিতদের কাছে সুপরিচিত যে, তিনি রবি'উল-আউয়াল মাসের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৬৬]

তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)জন্মস্থান সম্পর্কে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থে রয়েছে: "কঙ্কির জন্ম হবে শম্বল গ্রামে, গৃহের দ্বাররক্ষীর নিকটে, 'বিষ্ণুঘশ' নামক এক ব্যক্তির ঘরে।"[৬৭]

শম্বল গ্রামের অর্থ: নিরাপত্তাদানকারী শহর।

আর নিরাপত্তাদানকারী শহর হচ্ছে মক্কা।

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنِ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۬﴾ [البقرة: 126]

"স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলেছিল: 'হে আমার রব! একে নিরাপদ শহর বানিয়ে দিন।" সূরা আল-বাকারাহ: ১২৬।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

আর এ বাণী: ""বিষ্ণুযশ" নামক এক ব্যক্তির ঘরে।",
বিষ্ণুযশ শব্দের অর্থ: আল্লাহর বান্দা।

আবার এ আসন্ন নবীর মায়ের নাম হবে সুমতী: "কঙ্কির
জন্ম হবে বিষ্ণুযশের গৃহে তার স্ত্রীর সুমতীর গর্ভে।" [৬৮]

সুমতী নিরাপদ থেকে... অর্থাৎ: আমিনা (নিরাপদ)।

জানা বিষয় যে, নবী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়ের নাম: আমিনা।

হিন্দুধর্ম অনুসারে, কঙ্কি তার শম্বল গ্রাম থেকে বেরিয়ে
আসবে, শয়তানের সাথে যুদ্ধ করবে এবং অন্ধকার, দুর্নীতি
এবং অত্যাচার দূর করবে। তারপর তার শেষ সময়ে
সেখানে ফিরে আসবে। তারপর মহাপ্রভু (আল্লাহ) তাকে
আকাশে নিয়ে যাবেন।

এবং প্রত্যেক মুসলমান এই সত্যটি জানে যে, নবী
মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মক্কা ছেড়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং মানুষের
মধ্যে একত্ববাদ ছড়িয়ে দেন, তারপর তার মৃত্যুর কয়েক
বছর আগে বিজয়ী হিসাবে মক্কায় ফিরে আসেন।

হিন্দুধর্ম এই আগমনী নবীর সম্পর্কে আরো কতিপয়
বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে, যেগুলোর সাথে আমরা একমত নই,
যেমন: স্বীয় রীতি মোতাবেক, তাদের দৃষ্টিতে কঙ্কি হল

ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক (শারিরিক প্রকাশ), এ সব থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা এর আগে বিস্তারিতভাবে বেদ থেকে এই মিথ্যাচারের জবাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মূর্ত নন, আর না তাঁর আকাশ বা যমীন তাঁকে বেষ্টিত করতে পারে।

কিন্তু আগত নবী সম্পর্কে তাদের বইয়ে যে বৈশিষ্ট্য আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল তার মধ্যে একটি হল: তিনি একটি সাদা ঘোড়ায় চড়বেন। আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আল-মুর্তাজিয নামে একটি সাদা ঘোড়া ছিল।[৬৯]

হিন্দু মূর্তিগুলো আগত নবী কঙ্কিকে একজন সাদা ঘোড়ায় চড়ে এবং তার কাঁধে তলোয়ার রাখার মত করে চিত্রিত করে। আমি যে সমস্ত হিন্দু প্রতিমা এবং মূর্তি দেখেছি সেগুলি তাকে এভাবেই চিত্রিত করেছে।

তিনি একজন মুজাহিদ (সংগ্রামী) নবী। এটি হযরত মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুনাগুণ।তিনি তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেন এবং আল্লাহর শত্রুদের প্রতিহত করেন।

তাদের বই অনুসারে এই আগত নবী কঙ্কির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: তিনি অদৃশ্যের কথা বলবেন, তিনি তার

লোকদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং তিনি হবেন স্বল্পভাষী, উদার, শক্তিশালী গড়নের এবং সৌন্দর্যের স্বীকৃতি প্রদানকারী।

কিন্তু তাকে বিশেষভাবে আলাদাকারী বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে: "কল্পি তার সহচরদের মধ্য হতে চারজনের মাধ্যমে শয়তানকে ধ্বংস করবেন।" [৭০]

এ বাক্যটি পড়া মাত্রই একজন মুসলিমের মাথায় শুধু আবু বাকর, উমার ইবনুল খাত্তাব, উছমান ইবনু আফফান এবং আলী ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের কথাই আসবে।

এরা হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবী বা সহচর এবং তারাই তার দাওয়াতের শুরু পর্যায় থেকে তাকে সমর্থন করেছিলেন এবং তারা তার পরে তার উত্তরসূরি হয়েছিলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট চারজন সাথী ছিলেন, যারা তার নিকটবর্তী ছিলেন এবং তার সাথে দাওয়াতে সক্রিয় ছিলেন।

আর তাঁর মৃত্যুর পরে নিম্নোক্ত ধারাবাহিকতায় তারা মুসলিমদের খিলাফাত পরিচালনা করেছিলেন:

১. আবু বাকর আস-সিদ্দীক,

২. উমার ইবনুল খাত্তাব,
৩. উছমান ইবনু আফফান,
৪. আলী ইবনু আবী তালিব।

আর আলী ইবনু আবী তালিব রাঈিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর মাধ্যমে খিলাফাতে রাশিদার যুগ শেষ হয়ে গেছে।

কঙ্কির আরো নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে: যুদ্ধে তাকে সহযোগিতা করার জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা (দূত) অবতরণ করবে। [৭১]

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইসলামী জিহাদের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি, তার যুদ্ধসমূহে ফেরেশতাগণ আসমান থেকে অবতরণ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ [الأنفال: 9]

“স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকটে উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে, যারা একের পর এক আসবে।” সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৯।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, কব্জি 'রাম' নামক বড় দেবদূত (ফেরেশতা) হতে শিক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে পর্বতে গমন করবেন। এরপরে তিনি উত্তর দিকে যাবেন, তারপরে আল্লাহ (মহাপ্রভু) তাকে আসমানে (স্বর্গে) উঠিয়ে নেওয়ার আগে তিনি তার গ্রামে ফিরে আসবেন। [৭২]

হিন্দুদের কাছে 'রাম' হচ্ছে: বড় দেবদূত যে অস্বীকারকারীদের উপরে শাস্তি নিয়ে আসে। মুসলিমদের কাছে তিনি জিবরীল।

কার্যত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পর্বতে গিয়েছিলেন এবং জিবরাইল (আঃ) তার কাছে অবতরণ করেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতকারী হিসেবে উত্তর দিকে চলে যান। তারপর মৃত্যুর অল্প কয়েক বছর আগে মক্কাতে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, কব্জি হবেন শেষ প্রেরিত পুরুষ। [৭৩]

এটা সর্বজনবিদিত যে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনিই নবী ও রাসূলদের মধ্যে সর্বশেষ।

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ [الأحزاب: 40]

“মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।” সূরা আর-আহযাব, আয়াত: ৪০।

উক্ত আগত নবীর বর্ণনা হিন্দুদের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে: "অধিক প্রশংসাকারী/প্রশংসিত... নরশংস।"

নরশংস অর্থ হচ্ছে: অধিক প্রশংসাকারী/প্রশংসিত।

তথা: আরবীতে- মুহাম্মাদ অথবা আহমাদ।

এবং উভয় নামই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তিনি হলেন: মুহাম্মাদ এবং তিনিই আহমাদ।

নরশংসের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে যে: "তার রথ (বাহন) হবে উট, এবং তার বারোজন স্ত্রী থাকবে এবং সে তার রথ দিয়ে আকাশ স্পর্শ করবে এবং তারপর অবতরণ করবে।"[৭৪]

এই গুণাবলী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো উপরে প্রযোজ্য হয় না।

তার বাহন (রথ) হবে উট। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটি সুপরিচিত বিষয়। এটি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে, তা হল: তিনি শেষ নবী হবেন এটি হিন্দু গ্রন্থসমূহের ভাষ্য ছাড়াও

এটি আরো নির্দেশ করে যে, তিনি গাড়ি এবং বিমান আবিষ্কারের আগে আসবেন। [৭৫]

এতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই আগত নবী হিন্দু-ব্রাহ্মণদের বাইরে থেকে আসবেন; কেননা তারা উটকে নিষিদ্ধ মনে করে।

আর তার বারোজন স্ত্রী হবে, এটি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত থেকে জানা যায়।

তিনি তার রথ দিয়ে আকাশ স্পর্শ করবেন এবং তারপর অবতরণ করবেন। এটি ইসরা ও মিরাজে যাওয়ার ঘটনা, যা প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা এটি সংঘটিত হয়েছিল। যখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসমানে উত্থিত হয়েছিলেন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ একই অধ্যায়ে, নরশংসের দেশত্যাগের (হিজরতের) কথা বলছে এবং তার প্রশংসা করে বলছে: "হে মানুষ! তোমরা নরশংসের সম্মান কর, আমি সেই নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকারী দেশত্যাগীকে রক্ষা করব।"[৭৬]

সেই দেশত্যাগী: নবীর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি ছিল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত,

মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ও একত্ববাদ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

এবং পরবর্তী মন্ড্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, যেটি বলছে: "পবিত্রতার ঘোষণাকারীদের সাথে উক্ত পবিত্রতা ঘোষণাকারী যুদ্ধের জন্য বের হবে, আর মানুষকে নিরাপত্তা দেবে।"[৭৭]

তিনি একজন মুজাহিদ (সংগ্রামী) নবী যিনি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ছড়িয়ে দেন।

ইসলাম, ইসলামের নবী, তার জীবনী, তার দাওয়াত এবং মক্কা আল-মুকাররামা সম্পর্কে কয়েক ডজন সুসংবাদ রয়েছে তাদের গ্রন্থগুলোতে।

কিছু হিন্দু এই গ্রন্থগুলোর কিছু বিষয়ের সাথে একমত হতে পারে এবং তারা অস্বীকারও করতে পারে যে, এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এসেছে। এগুলো এমন সব বিষয়, যা সত্যকে অনুসন্ধানকারী কোন হিন্দুর জন্য এতে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নয়। কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সমর্থনকারী ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নয়। আর এ কারণেই আমি ভবিষ্যদ্বাণী বা সুসংবাদ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রচুর ও বিভিন্ন বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও তা দীর্ঘায়িত করিনি; কারণ ইসলামের বিশুদ্ধ হওয়ার সবচেয়ে বড় দলীল হচ্ছে: স্বয়ং ইসলামের

সুমহান বাণী, একত্ববাদের দাওয়াত, স্বভাবজাত প্রকৃতির আহ্বান এবং মানুষের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও পরিণাম জানার মাধ্যমে মানবিক প্রয়োজনে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর বুকে থাকা অন্যান্য প্রতিটি ধর্মের অপূর্ণাঙ্গতা।

সুতরাং পৃথিবীতে [অন্যান্য ধর্মে] বিকৃত পৌত্তলিকতা, শিরকী মতবাদ এবং নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এবং ইসলাম ছাড়া বিশুদ্ধ একত্ববাদ এবং আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণাকারী অন্য কিছুই নেই।

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

أَحَدٌ ۝﴾ [الإخلاص: 4-1]

“বলুন, ‘তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়। (১) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। (২) তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। (৩) ‘এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।’ (৪)” সূরা আল-ইখলাস।

১৮। ইসলাম কী?

উত্তর: ইসলাম হচ্ছে: আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুগত, বিনীত হওয়া এবং আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহ জালা শানুহ বলেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: 125]

“তার চেয়ে দীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।” সূরা আন-নিসা: ১২৫।

“আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে” এ কথার অর্থ হচ্ছে: সে মহাপবিত্র আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার প্রতি অনুগত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে, আমাদের রবকে পবিত্র বলে জানে। দীনদার হিসেবে এ লোকই হলো সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ﴾

فَاللَّهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ [الحج: 34]

“তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, কাজেই তারই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দিন বিনীতদেরকে।”
সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৩৪।

কাজেই তারই কাছে আত্মসমর্পণ কর” এ কথার অর্থ: তোমরা তাঁর হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পণ কর।

এ আয়াতসমূহ জানাচ্ছে যে, ইসলামের অর্থ হচ্ছে: আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, তাঁর সুমহান সত্তার প্রতি অনুগত হওয়া, তাঁর শরী‘আত ও মানহাজকে সন্তুষ্টচিত্তে ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে তা পালন করা, আর এটাই হচ্ছে ইসলামের মূলকথা ও বাস্তবতা।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালা ও তাঁর শরী‘আতের বিষয়ে আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করাই ইসলাম।

ইসলাম হচ্ছে সমগ্র মানুষের জন্য আল্লাহর দীন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: 19]

“নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম।” সূরা আলে ইমরান: ১৯।

সুতরাং ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যা ছাড়া আল্লাহ অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করবেন না।

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85]

“আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” সূরা আলে ইমরান: ৮৫।

ইসলামই হচ্ছে সেই দীন, যা দ্বারা আল্লাহ তা’আলা সকল নবী ও রসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। তাই সমস্ত নবী ও রসূলের ধর্মই এক, তা হচ্ছে ইসলাম। প্রত্যেক নবীই তাওহীদের বাণী নিয়ে এসেছিলেন, যদিও তাদের শরী’আতসমূহ ভিন্ন ছিল।

আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾

[الأنبياء: 25] ﴿فَاعْبُدُونِ﴾

“আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই অহী নাযিল করিনি যে, ‘আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।” সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫।

আর এ তাওহীদের উপরে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবশিষ্ট নেই।

ইসলাম হচ্ছে আজকের দিনে পৃথিবীর বুকে একমাত্র তাওহীদী দীন বা ধর্ম।

যেহেতু অন্যান্য শরী‘আতের প্রত্যেক অনুসারীদের মধ্যেই -কম হোক অথবা বেশী- শিরকের একটি অংশ বিদ্যমান। সুতরাং নবীদের মৃত্যুর পর এবং তারা মানুষকে তাওহীদের উপরে রেখে যাওয়ার পর, সময়ের ব্যবধানে মানুষ শিরক অবলম্বন করেছে। নবীরা যে নির্ভেজাল তাওহীদ নিয়ে এসেছিল তার ওপর বর্তমানে ইসলাম ছাড়া আর কোন দীন অবশিষ্ট নাই।

আর এ কারণেই ইসলামের বিশুদ্ধতার সবচেয়ে বড় দলীল যার প্রতি একজন লক্ষ্য করা উচিত তা হচ্ছে, এই নিরেট ভেজালমুক্ত তাওহীদী দীনের বাণী।

১৯। এমন সব প্রশ্নের জবাব ইসলামে রয়েছে, যার উত্তর দিতে জ্ঞান-বুদ্ধি হয়রান হয়ে যায়? যেমন: আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা এ পৃথিবীতে কেন এসেছি? আর আমরা কোথায় প্রত্যাবর্তন করব?

উত্তর: পবিত্র কুরআনের মাত্র একটি আয়াতেই ইসলাম এসব প্রশ্নের প্রতিটির উত্তর দিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: 22]

“আর আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, আমি তার 'ইবাদত করব না?’” সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ২২।

আমি কোথা থেকে এসেছি? আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন: “যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।”

আর আমি কোথায় যাব? আমি অচিরেই আল্লাহর কাছে যাব, আমার আমলের হিসাবের জন্য: "এবং যাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।"

কেন আমি এ পৃথিবীতে এসেছি? আল্লাহর ইবাদাত করা ও পরীক্ষা দেওয়ার জন্য।

আমি কেন আল্লাহর ইবাদাত করব? এটা প্রকৃতিগত বিষয় যে, আমি সেই আল্লাহরই ইবাদাত করব, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এটিই তো বান্দা ও তার রবের মধ্যকার প্রকৃতিগত সম্পর্ক ... বান্দা তার প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করবে। [আল্লাহর বাণী, যার অর্থ:] "আমার কী হল যে, আমি আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইবাদাত করব না?"

একটি আয়াতেই মানুষকে অবাক করা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব একত্রে রয়েছে।

﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: 22]

"আর আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, আমি তার 'ইবাদত করব না?' সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ২২।

২০। কীভাবে জানলাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা রাসূল?

উত্তর: অসংখ্য অলৌকিক বিস্ময়কর দলীল, যেগুলো অর্থগত মুতাওয়াতির ও পরিপূর্ণ ইয়াকীন তথা নিশ্চিত বিশ্বাস জন্ম দেয়।

অ্যারিস্টটল তার সামগ্রিক কাজের দ্বারা প্রমাণ করেছেন, সে একজন দার্শনিক। তার দেওয়া একক বিবৃতি বা তার দ্বারা পরিচালিত একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ দ্বারা নয়।

এবং হিপোক্রেটিস তার সামগ্রিক চিকিৎসা প্রকল্পের দ্বারা প্রমাণিত সে একজন চিকিৎসক। তিনি একটি একক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নয়।

একইভাবে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত অলৌকিকতার বিভিন্ন প্রমাণ, যা অর্থগত মুতাওয়াতির এবং পরিপূর্ণ ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, তিনি একজন নবী।

তুমি যদি তার তথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী লক্ষ্য কর, তাহলে দেখতে পাবে যে, তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং তার সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ

ছিলে। যারা তার প্রতি সবচেয়ে বিদ্বেষী ছিল তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারাই এবং তিনি কখনোই মিথ্যা বা অনৈতিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হননি। তারপরে তিনি অদৃশ্যের ব্যাপারে খবর দিতে লাগলেন, আর তা হুবহু ঘটতেও লাগল। তার আগে প্রথম দিন থেকে যে বিশ্বাসের আহ্বান জানিয়েছিলেন তা সকল নবীদের বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এবং তুমি এটাও দেখতে পাচ্ছ যে, তিনি সেই ব্যক্তি যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সকল নবীগণ। এছাড়াও হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো তার আগমনের শত শত বছর আগে থেকে তার ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছে। এ সবই তার রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে মুতাওয়াতির পর্যায়ের সংবাদ এবং পরিপূর্ণ ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

তারপরেও তিনি যা নিয়ে এসেছেন তথা আল-কুরআনুল কারীম, তার থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

আল-কুরআন হচ্ছে এমন গ্রন্থ, যার মাধ্যমে আল্লাহ বাক-রীতিতে পারদর্শী জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এ মর্মে যে, তারা যেন এর মত একটি গ্রন্থ নিয়ে আসে, অথবা কমপক্ষে একটি সূরা নিয়ে আসে; অথচ তারা তাতে সক্ষম হয়নি।

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٢٨﴾ [يونس: 38]

“নাকি তারা বলে, ‘তিনি এটা রচনা করেছেন?’ বলুন, ‘তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।” সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৮।

মহিমাম্বিত কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

﴿وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾﴾ [البقرة: 23-24]

“আর আমরা আমাদের বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (২৩) অতএব যদি তোমরা তা করতে না পারো আর কখনই তা করতে পারবে না, তাহলে তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে

কাফেরদের জন্য।” (২৪) সূরা আল-বাকারা: ২৩-২৪।
আল্লাহ তা‘আলার বাণী খেয়াল কর-

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ

لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ [البقرة: 24]

“তারা পারেওনি আর কখনো পারবেও না।” সূরা
আল-বাকারা: ২৪।

তারা করতে পারেনি, আর সক্ষমও হয়নি।

কুরআন আজ অবধি মুশরিকদের বাগ্মী ও বাক-পারঙ্গম
বিদ্বানদেরকে চ্যালেঞ্জ করেই চলেছে; অথচ তারা এর
মোকাবিলা করতে এখন পর্যন্ত অপারগ এবং এর সদৃশ
কোন গ্রন্থ আনতেও অক্ষম।

ড. আব্দুল্লাহ দিরাজ রহিমাল্লাহ বলেছেন: “নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী আশঙ্কা বোধ করেননি
যে, এ চ্যালেঞ্জ তাদের সাহিত্যিক উত্তেজনাকে প্ররোচিত
করবে?

যার ফলে, তারা সকলেই একসাথে উদ্বিগ্ন হয়ে তার
বিপরীতে প্রতিযোগিতা ব্যাপিয়ে পড়বে, আর তিনি কী
করতে পারতেন যদি তাদের বাগ্মীদের একদল লোকেরা
একত্রিত হয়ে এমন একটি বাণী রচনায় তার সাথে

প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত হত, যদিও তা কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হোক না কেন!

তদুপরি, যদি তিনি এই চ্যালেঞ্জটি তার সময়ের লোকদের কাছে ঘোষণা করার জন্য নিজে থেকেই উৎসাহী হয়ে থাকেন, তবে কীভাবে তিনি তা আগামী প্রজন্মের কাছে তা পেশ করবেন?

এটা এমন এক দুঃসাহসিক কাজ যে, একজন মানুষ যে তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানে, সে কখনো এ দিকে অগ্রসর হবে না, যতক্ষণ না তার দুটি হাত ভাগ্যের ফয়সালা পরিবর্তন অথবা আসমানী সংবাদ দ্বারা পূর্ণ থাকে। আর এভাবেই তিনি মানুষের মধ্যে তা ছুড়ে দেন, আর সেটাই চূড়ান্ত ভাগ্য হয়ে দাড়ায়। সুতরাং যুগ যুগ ধরে সময়ের আবর্তনে এর পরে যেই তার বিরোধিতা করবে সকলেই স্পষ্ট অপারগতা ও চরম ব্যর্থতার দ্বারা লাঞ্চিত হবে।"[৭৮]

তখন এই মুশরিকরা দেখতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যদল ও দলসমূহ একত্রিত করা কুরআনের বিরোধিতা এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের চেয়ে সহজতর। সুতরাং এটাই তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ছিল। আর কাফিররা বলে,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾

[فصلت: 26]

'তোমরা এ কুরআনের নির্দেশ শোন না এবং তা পাঠকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।' সূরা ফুসসিলাত: ২৬।

সমস্ত আরব বা অন্যান্য জাতি যাদের কাছে চ্যালেঞ্জ পৌঁছেছে, তারা এমন কিছু তৈরি করতে পারেনি যার মাধ্যমে নাস্তিক বা অন্যান্যরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে।

আলুসী রাহিমাল্লাহ বলেছেন: “আমাদের আজকের দিন পর্যন্ত কেউ তার মুখ থেকে এমন কিছুই উচ্চারণ করেনি, অথবা এমন বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পন্ন কিংবা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও কেউ কিছু প্রকাশ করেনি।”

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) বলেছেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের সালাতে সূরা আত-তূর পড়তে শুনেছি, যখন তিনি এ আয়াতে পৌঁছালেন:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ

لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [الطور: 35-37]

“তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (৩৫) নাকি তারা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না। (৩৬) আপনার

রবের গুপ্তভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, নাকি তারা এ সবকিছুর নিয়ন্তা? (৩৭) সূরা আত্ব-তূর: ৩৫-৩৭।

জুবাইর বলেন: “আমার অন্তর প্রায় উড়তে শুরু করল।”
[৭৯]

সুতরাং কুরআনের মধ্যে অলৌকিক সব রহস্য রয়েছে, যা মানুষের অন্তরের মধ্যে পৌঁছে যায়।

ভেবে দেখ! মুশরিক নারীরা কুরআনের দ্বারা আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়ে কিভাবে আবু বাকরের বাড়ীর চারপাশে ভিড় জমাত, যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যা কুরাইশদেরকে ভীত করে তোলে। [৮০]

আর এ কারণেই আরব প্রতিনিধিরা সম্মত হয়েছিল যে, তারা কুরআন শুনবে না এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরও শুনতে দেবে না; কারণ কুরআন অস্বীকার করে কুফুরীর উপর টিকে থাকার এই একটি মাত্র উপায়ই ছিল।

কুরআনের বিস্ময়কর ও অলৌকিক বিষয়সমূহের মধ্যে আরো রয়েছে -আর এর আশ্চর্যের কোন শেষ নেই-: যা ড. আব্দুল্লাহ দিরাজ রাহিমাল্লাহ কুরআনের আয়াতসমূহ বিভিন্ন সময়ে নাযিল হওয়া। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইঙ্গিত দেওয়া যে, কতিপয়

আয়াত এ সূরার নির্দিষ্ট স্থানে, আবার অন্য আয়াত অন্য সূরার অন্য স্থানে রাখা। এরপরে সবশেষে প্রতিটি সূরা আলাদাভাবে একটি স্থাপনার মত প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদির আলোচনাতে উল্লেখ করেছেন। তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "কুরআন অবতরণের সময়ে কুরআনের কতিপয় অংশ বিচ্ছিন্নভাবে অন্যস্থানের সাথে অতিরিক্ত হিসেবে নাযিলকৃত অংশের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, পরবর্তীতে নাযিল হওয়া অন্যান্য আয়াতসমূহ যোগ হয়ে ধারাবাহিকভাবে পর্যায়ক্রমিক স্বতন্ত্র অধ্যায় (সূরা) হিসেবে গঠিত হচ্ছিল। নাযিলকৃত একটি অংশ একবার এখানে যোগ হচ্ছিল, আবার অন্য একটি অংশ সেখানে অন্যান্য অংশের সাথে প্রবেশ করছিল, [আর তা হচ্ছিল] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুসারে, যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন পবিত্র আত্মা জিবরীলের কাছ থেকে পর্যায়ক্রমিক পঠনের মাধ্যমে।

যদি আমরা অসংখ্য তারিখসমূহ বিবেচনা করি - মহিমাম্বিত কুরআনের আয়াত নাযিলের তারিখগুলো- এবং আমরা লক্ষ্য করি যে এই অহী সাধারণত বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং উপলক্ষগুলোর সাথে সম্পর্কিত ছিল, তাহলে এটি আমাদের সেই সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসার দিকে নিয়ে যায়, যখন প্রতিটি সূরাকে একটি স্বাধীন অধ্যায়ে সংগঠিত করার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছিল।

যেন কুরআন মূলত একটি পুরাতন স্থাপনার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত টুকরাসমূহ, যাকে অন্য একটি স্থানে ঠিক তার আগের রূপে পুনরায় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অন্যথায় একই সাথে এতটা দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই তারতীব (ক্রমধারা) ও পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা কিভাবে সম্ভব, যা অধিকাংশ সূরার সাথেই সম্পৃক্ত ছিল?

কিন্তু ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, তাদের শরয়ী (আইনী) প্রয়োজনীয়তা এবং তার কাঙ্ক্ষিত সমাধান, সেইসাথে এগুলোকে আবশ্যিকীয়ভাবে এমন ভাষাগত উপস্থাপন করতে হবে, যা সেগুলোর সমাধান বাতলে দেয় এবং এই সূরার সাথে তার শৈলীগত সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে, যা ঐ সূরার সাথে নেই, এই সার্বিক পরিকল্পনা তৈরি করার সময় একজন ব্যক্তি কী কোন ঐতিহাসিক গ্যারান্টি পেতে পারেন?

আমরা কি তাহলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই না যে, এই পরিকল্পনার সমাপ্তি এবং কাঙ্ক্ষিত উপায়ে এর বাস্তবায়নের জন্য একজন মহান স্রষ্টার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, যিনি এই কাঙ্ক্ষিত সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা রাখেন?"[৮১]

সুতরাং কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতার একটি স্বতন্ত্র অলৌকিক প্রমাণ।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সংঘটিত হাজারেরও অধিক মুজিয়া রয়েছে। তাদের যুগ খুব কাছাকাছি ছিলো এবং এগুলোর বর্ণনাকারীগণও সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী এবং পরহেযগার লোক ছিলেন।

আর এ সমস্ত বর্ণনাকারীগণ, যারা আমাদের কাছে এ সমস্ত মুজিয়াগুলো বর্ণনা করেছেন, তারা ছোট খাটো সূক্ষ্ম বিষয়েও মিথ্যা বলাকে বৈধ মনে করতেন না। তাহলে কিভাবে তারা রাসূলের উপরে মিথ্যা আরোপ করবেন? অথচ তারা এ কথা জানেন যে, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তার উপরে মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।" যেমনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন অনেক মুজিয়া রয়েছে, যেগুলো তার পাশে থাকা হাজার হাজার সাহাবী দেখেছেন। আবার কিছু এমন রয়েছে যেগুলো ডজন-ডজন সাহাবী দেখেছেন। কিভাবে তারা এ ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করার জন্য একমত হতে পারে?

মানুষের মধ্য হতে বড় একটি দল প্রত্যক্ষ করেছেন এমন একটি মুজিয়া হচ্ছে: খেজুর গাছের কান্না করার হাদীস। এটি একটি প্রসিদ্ধ মুতাওয়াতিহ হাদীস, যেখানে রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর

গাছের উপরে খুতবা দিতেন, যখন তার জন্য মিস্বারের ব্যবস্থা করা হল, এবং তিনি মিস্বারের উপরে উঠে খুতবা দিতে লাগলেন, তখন খেজুর গাছটি কান্না শুরু করল, একদম শিশু বাচ্চাদের ন্যায় কাঁদতে থাকল, আর শব্দ করতে থাকল যতক্ষণ না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন সেটি চুপ হয়ে গেল।

এ হাদীসটি সাহাবীদের মধ্য থেকে যারা বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছেন: আনাস ইবনু মালিক, জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, উবাই ইবনু কা'ব, আবু সা'ঈদ, সাহল ইবনু সা'দ, আয়িশাহ বিনতু আবী বাকর এবং উম্মু সালামাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

সুতরাং সাহাবীদের এত বড় একটি সংখ্যা এ জাতীয় সংবাদ বর্ণনার ক্ষেত্রে কী একমত হতে পারেন?

বরং তার কতিপয় মুজিযা প্রত্যক্ষ করেছেন হাজার হাজার সাহাবী, যেমন: তার আঙুল হতে পানি বের হওয়া, এমনকি তা দ্বারা ১৫০০ সাহাবী অযু করেছেন এবং তা থেকে পান করেছেন। এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, যা একটি মুতাওয়াতির হাদীস।

স্বল্প খাদ্যকে বৃদ্ধি করে বড় একটি সৈন্যদলকে তা দ্বারা খাওয়ানো। এটিও সাহাবীদের থেকে মুতাওয়াতির সংবাদ

হিসেবে এসেছে। শুধুমাত্র ইমাম বুখারীই তার সহীহ নামক গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে খাদ্যসমূহ বৃদ্ধি হওয়ার এ মুজিয়ার বর্ণনা পাঁচটি স্থানে এনেছেন। [৮২]

সুতরাং যখন সত্যতার দলীলসমূহ প্রতিষ্ঠিত আর অসংখ্য মুজিয়া তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নবুওয়তের প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান, তাহলে কীভাবে একজন বিবেকবান ব্যক্তি এসব অস্বীকার করতে পারে?

এখানে তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) অলৌকিক কাজের আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

কোন একরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছিলেন যে, প্রচণ্ড বাতাস বইবে এবং তিনি কাউকে দাঁড়াতে নিষেধ করলেন। তারপরও একজন লোক তখন দাঁড়ালে বাতাস তাকে অনেক দূরে নিয়ে নিষ্ক্ষেপ করেছিল। [৮৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিলেন, ঠিক নাজাশীর মৃত্যুর দিনেই এবং চার তাকবীরে তার জানাযা আদায় করেছিলেন। [৮৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার, উসমান, আলী, ত্বালহা এবং যুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের

শাহাদাতের সংবাদ দিয়েছিলেন। আর তারাও স্বাভাবিকভাবে তাদের বিছানাতে (বাড়ীতে) অন্যান্য মানুষদের ন্যায় মারা যাননি।

একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, ত্বালহা এবং যুবাইরকে সাথে নিয়ে পাহাড়ের উপরে আরোহন করলেন, তখন পাথর নড়াচড়া শুরু করলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়কে বলেছিলেন: “থাম, তোমার উপরে অবশ্যই একজন নবী, সিদ্দীক এবং শহীদ রয়েছেন।” [৮৫]

তিনি তার নিজের জন্য নবুওয়তের সিদ্ধান্ত দেন। আবু বাকরকে সত্যবাদিতার ফায়সালা দেন। আর অন্যান্যদেরকে অচিরেই শাহাদাতপ্রাপ্ত হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন, তা সেভাবেই ঘটেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের কাছে দু'আ করা মাত্রই তার দু'আর জবাব (ফল) দেওয়া হয়েছে, আর মানুষ তা প্রত্যক্ষ করেছে এমন (প্রায়) ১৫০ হাদীস রয়েছে। [৮৬]

মক্কার লোকেরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি নিদর্শন দেখাতে বললে, তিনি চাঁদকে

দুটি অংশে বিভক্ত করে দেখালেন, ফলে তারা উভয়ের মাঝখানে হীরা পর্বত দেখতে পেল। এ হাদীসটি মুতাওয়াতির, তথা: এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধ বর্ণনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বড় সমাবেশে যেমন: শুক্রবার এবং ঈদের ময়দানে সূরা আল-কামার পাঠ করতেন, যেখানে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে লোকেরা এতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক ঘটনা শুনতে পায়, তিনি এটা দ্বারা তার নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ দিতেন।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, আদম ছিলেন জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যে সর্বশেষ সৃষ্টি: "আদমকে সৃষ্টির শেষ সময়ে শুক্রবার আসরের নামাজের পর। সর্বশেষ সৃষ্টি।"[৮৭]

এবং এ সত্যটি এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মানুষই পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়া শেষ জীবিত প্রাণী। তাহলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিভাবে জানলেন যে, পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাবের পর আদম আলাইহিস সালামই সর্বশেষ জীবিত সৃষ্টি?

মহান আল্লাহর কথার দিকে লক্ষ্য কর:

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ
تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ [الإسراء: 12]

“আর আমরা রাত ও দিনকে করেছি দুটি নিদর্শন তারপর রাতের নিদর্শনকে মুছে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকজ্বল করেছি।” সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১২।

“তারপর রাতের নিদর্শনকে মুছে দিয়েছি”: তথা চাঁদ হচ্ছে রাতের নিদর্শন, যা আলোকিত ছিল তারপর তার আলো মুছে দেয়া হয়।

এবং প্রকৃতপক্ষে সাহাবীগণ এটাই এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম ইবনে কাসীর তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: “চাঁদ সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করত, যা ছিল রাতের নিদর্শন। তারপরে তার আলো মুছে দেওয়া হয়েছে।”

আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, বিজ্ঞান আজ এই উপসংহারে পৌঁছেছে, NASA তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অফিসিয়াল চ্যানেলে প্রকাশ করেছে: চাঁদের জীবনের প্রথম যুগ, এবং তখন এটি ছিল প্রজ্জ্বলিত আলোকজ্বল।

[৮৮]

মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, গায়িবের নিদর্শন, খবরসমূহ এবং পৃথিবী ও আসমানের অগণিত ক্ষুদ্র রহস্য এক ব্যক্তির (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) হাতে ছিল, এবং তাঁর কাছে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তার পূর্বের নবীরা যা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তাই নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর তিনি শরী'আত পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগ পর্যন্ত মারা যাননি।

সুতরাং নিশ্চিতভাবেই তিনি একজন নবী, এটাই বিবেকের প্রতিষ্ঠিত সাক্ষ্য।

সুতরাং তার (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) গায়িবের নিদর্শনসমূহ হাজারেরও অধিক।

আর তার এসব নিদর্শনের (মুঘিজাসমূহের) বর্ণনাকারী হচ্ছেন তাঁর সাহাবীগণ, যারা তারপরেই সবচেয়ে সত্যবাদী এবং সবচেয়ে ন্যায়বান।

আশ্চর্যের বিষয় হল যে, মহান সাহাবীরা অলৌকিক ঘটনা দেখার আগেই ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; কারণ তারা জানতেন যে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদী এবং তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি।

মহান সাহাবীদের এই অবস্থান একটি বিজ্ঞ বুদ্ধিমত্তার অবস্থান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদীতাই তাঁর নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট দলীল।... এর কারণ: যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবি করেন, হয়তো মানুষের মধ্যে তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী। কারণ তিনি একজন নবী... যেহেতু নবী মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী।

নয়তো সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী; কেননা সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় একটি বিষয়ে মিথ্যা দাবী করে থাকে।

একান্ত নিরেট অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে সবচেয়ে সত্যবাদী ব্যক্তি ও সবচেয়ে মিথ্যাবাদী এক মনে হতে পারে না। [৮৯]

সুতরাং একজন বিবেকবান মানুষের পক্ষে সত্যবাদী মানুষ এবং মিথ্যুক মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা খুবই সহজ।

মুশরিকরা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়তের প্রথম দিনেই স্বীকার করেছিল যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। তারা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল: "তোমার থেকে আমাদের কোন মিথ্যার অভিজ্ঞতা হয়নি।" [৯০]

এবং যখন হেরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণের আগে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "তিনি যা বলেছেন, তা বলার আগে আপনারা কি তাকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযুক্ত করেছিলেন?"

তখন আবু সুফিয়ান বলেছিলেন: "না।"

তখন হেরাক্লিয়াস বলেছিল: "মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করা ব্যক্তি আল্লাহর উপরে মিথ্যাচার করতে পারে না।"

তারপর হেরাক্লিয়াস তার বিখ্যাত উক্তিটি করেছিল: "আমি যদি তার সাথে থাকতাম তবে আমি তার দুই পা ধুয়ে দিতাম।"[৯১]

কাফেররা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমগ্র জীবনে একটি মিথ্যাও খুঁজে পেতে অক্ষম হয়েছে। সে কারণেই কুরআন তাদের কুফুরী বা অস্বীকার করাকে নাকচ করেছে; কেননা তারা নবুওয়তের আগে তার অবস্থা সম্পর্কে জানত। আমাদের সুমহান রব বলেছেন:

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ [المؤمنون: 69]

"নাকি তারা তাদের রাসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করছে?" সূরা আল-মুমিনুন: ৬৯।

সুতরাং নবীর অবস্থা এবং তাঁর জীবনীই একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ যে, তিনি একজন নবী।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সুতরাং যখন সত্যের কারণগুলো সাধারণত পারস্পরিকভাবে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়্যাত প্রমাণে সমর্থন করে, তখন একজন বিবেকবান হিন্দু কীভাবে এই সমস্ত অস্বীকার করতে পারে?

২১। আল্লাহর উপরে ঈমান এনে (বিশ্বাস করে) নবীদেরকে অবিশ্বাস করা কী যথেষ্ট হবে, কতিপয় হিন্দুরা যেমন করে?

উত্তর: না।

নবীগণকে বিশ্বাস না করে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যথেষ্ট নয়; যতক্ষণ না সে আল্লাহর জন্য আত্ম-সমর্পনকারী (মুসলিম) হবে। আল্লাহর উপর ঈমান আনা, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও পরিচালক বলে বিশ্বাস করার কি অর্থ হতে পারে যখন তুমি তাঁর অহীকে অস্বীকার কর এবং তাঁর রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান কর?

এটি একটি বড় ধরনের কুফর।

প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অহীকে প্রত্যাখ্যান করে, তার কাজের চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু নেই, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾﴾ [النساء: 150-151]

নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) তারতম্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতক-এর উপর ঈমান আনি এবং কতকের সাথে কুফরী করি'। আর তারা মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়, (১৫০) তারাই প্রকৃত কাফির। আর আমরা প্রস্তুত রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (১৫১) সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫১।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ঈমান আনে; অথচ নবীদেরকে অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষেই কাফির বা অস্বীকারকারী।

সুতরাং নবীদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন একজন নবীকে অবিশ্বাস করে, সে আল্লাহর ব্যাপারেও অবিশ্বাসী; কারণ সে আল্লাহর অহীকে অস্বীকার করেছে। অতএব, আহলে কিতাবদের মধ্য হতে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহকে

অবিশ্বাস (কুফুরী) করেছে; যেহেতু তারা মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতকে অবিশ্বাস করেছে।

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: 6]

“নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির নিকৃষ্টতম।” সূরা আল-বাইয়িনাহ, আয়াত: ৬। তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো বিষয়ে আল্লাহর হুমকি সত্য।

﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلُّ كَذَّابٍ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾ [ق: 14]

“ফলে তাদের উপর আমার শাস্তির অঙ্গীকার যথার্থভাবে আপতিত হয়েছে।” সূরা ক্বা-ফ, আয়াত: ১৪।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা শুধুমাত্র এগুলোর স্বীকৃতি প্রদান ইসলাম নয় এবং মুক্তিও নয়। বরং অবশ্যই তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনতে হবে।

সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্বের ঈমান আনা আর তাঁর নবীদেরকে অস্বীকার করা ঈমান বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট

হবে না। আর এটা আল্লাহর কাছে কিয়ামাতের দিন কোন উপকারেও আসবে না। সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর সকল রাসূলের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কোন গতান্তর নেই।

যদি শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট হত, তাহলে তিনি তাঁর রাসূলদেরকে পাঠাতেন না এবং তাঁর কিতাবসমূহও নাথিল করতেন না; কেননা সমগ্র মানুষেরাই তাদের প্রকৃতিগত কারণেই আল্লাহকে চিনে।

সুতরাং আল্লাহ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, পথ দেখিয়েছেন এবং রিযিক দিয়েছেন, তিনি তাঁর রসূল ও নবীদের মাধ্যমে যে শরী'আত প্রণয়ন করেছেন সে অনুযায়ী তিনিই একমাত্র তোমার ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য।

সুতরাং, সকল নবী এবং তাদের মধ্যে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি মানুষের ঈমান আনা অত্যাবশ্যিক।

২২। আল্লাহ তা'আলা কেন মন্দ বা অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন? অথবা অন্য কথায়: একজন মুসলিম কীভাবে 'মন্দের জটিলতা' থেকে রক্ষা করবে?

উত্তর: হিন্দুধর্মে মন্দের সমস্যা প্রায় সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং হিন্দু ধর্মের দর্শন এ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে, একজন ব্যক্তি মন্দ থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত নির্জন স্থানে বাস করা উচিত। হিন্দুধর্ম এও মনে করে যে, আগের জীবনে কেউ মন্দ কাজ করেছে বলেই তার ফলস্বরূপ তার পুনরায় জন্ম হয়।

আর এগুলো সবই ভুল। বরং মন্দ পৃথিবীতে খুব সাধারণভাবেই বিদ্যমান: কেননা আমরা শরীআতের বিধান পালনে আদিষ্ট।

কেননা আমরা পরীক্ষার জগতে রয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾﴾

[الأنبياء: 35]

“আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি।” সূরা আল-আশ্বিয়া: ৩৫।

সুতরাং ভালো-মন্দ থাকবে; কারণ তুমি একজন পরীক্ষার্থী, আর পরীক্ষিত হওয়া তোমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

[المالك: 2]

“যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।” সূরাতুল মুলক, আয়াত: ০২।

যতক্ষণ আমরা পরীক্ষা ক্ষেত্রে থাকি, ততক্ষণ সেখানে ফিতনা (সমস্যা) এবং বিপর্যয় থাকা স্বাভাবিক এবং আমাদের মনে নিমজ্জিত হওয়াও স্বাভাবিক।

মন্দ কাজ করা, কতক গুনাহ করা, এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা থাকা হচ্ছে, মানব স্বভাবের স্বাভাবিক চাহিদা এবং তাকলীফে ইলাহী ও ইচ্ছা স্বাধীনতার সাধারণ ফলাফল।

মন্দ, বিপর্যয়, মুসিবত এবং লালসার উপস্থিতি, এগুলো সব একজন ভালো মানুষের সবোর্ধমটি ও একজন খারাব মানুষের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দিকটি বের করে নিয়ে আসে।

মন্দের পাশাপাশি আমরা বাস করি অসংখ্য ভালো বস্তুর মধ্যে।

এবং অগণিত নি'আমাতের মধ্যে।

আমরা যত বড় বড় উত্তম বা কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকি, তার পাশে মন্দ খুব সাধারণ ও সামান্য।

পৃথিবীতে যদি কোন মন্দ না থাকত, তাহলে আপনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেখান থেকে বের হতেন না!

এবং কোন সভ্যতার অস্তিত্ব থাকত না, কোন শহর, কলকারখানা, বাড়িঘর তৈরি হত না। মানুষের কোন কাজের প্রয়োজন হত না। কোন রোগ প্রতিরোধ, কোন সমস্যা সমাধান বা স্বস্তি নিয়ে আসে এমন কোন ধারণা উদ্ভাবন করার কথা মানুষ ভাবত না!

আর কোন মানুষই প্রকৃতপক্ষে তার জন্মস্থান ছেড়ে অন্যত্র যেত না।

যেহেতু কোন মন্দ কিছু নেই, কোন ঝামেলা নেই, কোন কষ্ট বা বিপর্যয় নেই, কোন ক্লান্তি নেই এবং কোন সমস্যায় নেই যার সমাধান আবিষ্কার করা যেতে পারে!

তাহলে কেনইবা ক্লান্ত হওয়া, রাত জেগে থাকা, চিন্তাভাবনা করা এবং কার্য সম্পাদন করা?

সুতরাং মন্দ একটি অপরিহার্যতা যা এই দুনিয়াতে অনিবার্য!

সুতরাং তুমি চিন্তা কর!

অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যাদের উপরে দুর্যোগ এবং মন্দ আপতিত হয়, তারপরে তারা আল্লাহর কাছে ফিরে আসে এবং ধার্মিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মহিমাম্বিত মহান আল্লাহ এবং প্রশংসা কেবল তাঁরই।

সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় বা তাকদীরের প্রতিটি বিষয়েই হিকমত এবং কল্যাণ রয়েছে, যদিও বাহ্যিকভাবে কিছু বিষয় মন্দ বা অকল্যাণকর, সংকীর্ণ ও কষ্টকর মনে হয়। তবুও তা পরিশেষে বড় ধরনের ভালো (কল্যাণ) এবং ইলাহী পূর্ণাঙ্গ হিকমত নিয়ে আবির্ভূত হয়।

আর তাই, মন্দ শুধু পরীক্ষিত হওয়ার কারণে, এ কারণে নয় যে, তুমি পূর্ব জন্মে পাপে লিপ্ত ছিলে।

২৩। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আত্ম-
সমর্পনের স্বরূপ কী? অথবা অন্য
কথায়: কীভাবে তুমি বুঝতে পারবে
যে, তুমি আল্লাহর জন্য একজন
মুসলিম-অনুগত ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতি
পূর্ণাঙ্গ একজন আত্মসমর্পণকারী?

উত্তর: আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ চার প্রকার:

প্রথম: তোমার জীবনের ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়ে
আল্লাহর গোলামী বা দাসত্ব করা, আল্লাহ তা'আলা
বলেছেন:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ

وَبَدَّلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [الأنعام: 163-162]

"বলুন, 'আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার
জীবন ও আমার মরণ বিশ্বজগতের রব আল্লাহরই
জন্য।" (১৬২) 'তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমাকে
এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি

মুসলিমদের মধ্যে প্রথমা' (১৬৩)" সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩।

"আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।" এর অর্থ: আমি প্রতিটি কাজই আল্লাহর জন্য করে থাকি। এটাই হল প্রতিটি কাজে আল্লাহর দাসত্ব করা এবং এটিই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করার আলামত ও স্বরূপ।

দ্বিতীয় নিদর্শন- যতক্ষণ না তুমি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করছ: তা হল- আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করা। আমাদের সুমহান রব বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾

[الأنفال: 20]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না।" সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২০। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: 208]

“হে ঈমানদ্বারগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর।” সূরা আল-বাকারা: ২০৮।

السِّلْمِ فِي শব্দের অর্থ: ইসলামের মধ্যে।

যার অর্থ: “তোমরা সকলে ইসলামে প্রবেশ কর”: অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা মেনে চল এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।

আল্লাহ আমাকে কুরআনে কিছু আদেশ করেছেন, অথবা আমাকে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত অনুযায়ী কিছু করার আদেশ দিয়েছেন, আমি তা করব... তিনি আমাকে কিছু কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা থেকে আমি বিরত থাকব, এটাই হচ্ছে আল্লাহর কাছে পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর গোলামী।

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের তৃতীয় নিদর্শন হল: তাঁর আইন-কানুনকে মেনে নেয়া। সুতরাং তাঁর শরী‘আতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবো এবং তা গ্রহণ করব।

আমরা কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত হতে থাকা প্রতিটি ইলাহী বিধানকে গ্রহণ করব; কারণ আল্লাহই জানেন কোন বস্তু তাঁর বান্দাদের চরিত্রকে সংশোধন করে থাকে।

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [المالك: 14]

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।” সূরাতুল মুলক, আয়াত: ১৪। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٤﴾﴾

[المائدة: 50]

“হুকুমের দিক থেকে আল্লাহর চেয়ে আর কে উত্তম হতে পারে?” সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৫০।

সুতরাং দুনিয়া এবং আখিরাতে মানুষের জন্য কোনটি সবচেয়ে ভালো, তা আল্লাহই জানেন।

আর আল্লাহর আইনের প্রয়োগ মানুষকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদের নিরাপদে বাস করতে শেখায়।

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾﴾ [النساء:

[64]

“তোমাদের কাছে কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি; কিন্তু আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের অনুকরণ করার জন্যই।” সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৪।

আল্লাহ রাসূলদের এ জন্য পাঠাননি যে, আমরা তাদের শরী'আত ছেড়ে দেব এবং তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের আইনের কাছে সমাধান চাইব।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء: 65]

“কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।” সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫।

আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। কেননা আল্লাহর বিধানের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করা ইসলামের আনুগত্যের অন্যতম লক্ষণ।

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের চতুর্থ নিদর্শন হল: আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের কাছে আত্মসমর্পণ। কারণ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা তাঁর হিকমাতের দ্বারা নির্ধারণ করেছেন। এবং তাই একজন মুসলিম আল্লাহর প্রতিটি

তাকদীরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে... হোক তা ভালো অথবা মন্দ।

যদি কোন মুসলিমের উপর সমৃদ্ধি বা সুখকর সময় আসে, তবে সে শুকরিয়া আদায় করে আর যদি তার উপরে বিপদ আসে, তবে সে সবর করে।

সুতরাং প্রতিটি বিপর্যয়ই কোন না কোন হিকমাত এবং পরীক্ষার জন্য।

সবকিছু সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালা অনুযায়ীই হয়: সুস্থতা, অসুস্থতা, সম্পদ, দারিদ্র... সবকিছুই তাঁর বিচার ও হিকমাত অনুসারে, এবং মুসলমানকে অবশ্যই পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকতে হবে কারণ এটি আল্লাহই নির্ধারণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾﴾ [القمر: 49]

“নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।” সূরা আল-ক্বমার, আয়াত: ৪৯। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾ [التوبة: 51]

“আপনি বলুন! আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের উপরে আসবে না।” সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫১।

কখনোই আমাদের উপরে তা আপতিত হবে না, যা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখেননি।

মহা সম্মানিত আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾﴾ [آل عمران: 145]

“আর কোন প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মারাও যায় না।” সূরা আলে ইমরান: ১৪৫।

মৃত্যুর সময়কে আল্লাহ তা‘আলাই নির্ধারণ করে রেখেছেন।

মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটে, প্রত্যেকটি পরমাণু যা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে এবং প্রতিটি ঘটনা যা ঘটে, তা আল্লাহর জ্ঞান, তাঁর চাওয়া, তাঁর ফায়সালা, প্রজ্ঞা এবং তাঁর কুদরতে ঘটে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي

الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾﴾ [الفرقان: 2]

“তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নিপুণভাবে নিরূপণ করেছেন।” সূরা ফুরকান: ০২।

তিনিই সুমহান সত্তা, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, প্রতিটি জিনিস নির্ধারণ করেছেন, তিনি যা চেয়েছেন তা হয়েছে আর তিনি যা চাননি, তা হয়নি।

সুতরাং একজন মুসলিম হিসাবে, আমাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সমস্ত ফয়সালার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে।

আর এভাবেই মানুষ আল্লাহর জন্য নিবেদিত প্রকৃত মুসলিম হতে পারে।

সবশেষে, আমি কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করব?

ইসলাম হচ্ছে সমগ্র মানুষের জন্য আল্লাহর দীন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...﴾ [আল عمران: 19]

“নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম।” সূরা আলে ইমরান: ১৯। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যা ছাড়া আল্লাহ অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করবেন না।

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾

[আল عمران: 85]

“আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে, তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” সূরা আলে ইমরান: ৮৫।

আর এ কারণে হিন্দু অথবা অহিন্দু প্রতিটি মানুষের উপরেই আবশ্যিক হবে ইসলাম গ্রহণ করা।

ইসলামের মধ্যেই রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে সফল হওয়া।

ইসলামে প্রবেশ করা সবচেয়ে বড় নিয়াআত। বরং তা হচ্ছে তোমার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়।

ইসলাম হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ফিতরাত (সহজাত প্রবৃত্তি), বিবেক ও বেদের প্রতি ফিরে যাওয়া।

আর ইসলামে প্রবেশ করা সহজ। এতে কোন সাধনা বা আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র কেউ শাহাদাতাইন উচ্চারণ করলেই হয়, আর তা হচ্ছে : لا أن أشهد : الله رسول محمدًا أن وأشهد الله إلا إله "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

আর এর মাধ্যমেই উক্ত ব্যক্তি মুসলিম হয়ে যাবে।

তারপর সে ইসলাম মেনে চলবে।

আর আমি প্রত্যেককেই তার নিজস্ব ভাষায় 'ইসলাম হাউস ওয়েব'কে অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছি, যাতে করে প্রতিটি নতুন মুসলিম ইসলাম মেনে চলার বিষয়গুলো শিখে নিতে পারে।

ওয়েব লিংক: <https://islamhouse.com/ar/>

সূচক

সৃষ্ট জ্ঞান, মানব স্বভাব ও মৌলিক শিক্ষার মানদণ্ডে হিন্দুধর্ম.....	1
১। হিন্দুধর্ম কী?	15
২। এ জটিলতা সমেত কিভাবে এ ধর্মের গোড়াপত্তন ঘটেছিল?.....	17
৩। হিন্দুদের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস কী?.....	18
৪। হিন্দুধর্মে এক ইলাহকে অসংখ্য মূর্তির মাধ্যমে প্রতিকৃতি প্রদানের চিন্তাধারার কিভাবে উদ্ভব ঘটেছিল?	24
৫। হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ককে কীভাবে দেখে? ...	29
৬। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে হিন্দুধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?	38
৭। হিন্দুদের কাছে বারবার জন্ম নেওয়া ও পুনর্জন্ম ধারণার উৎস কী?	44
৮। হিন্দুরা মহাবিশ্বের প্রতি কীভাবে দৃষ্টি দেয়?.....	48
৯। হিন্দুধর্ম অনুসারে মানুষের শরীর কিসের তৈরী?	50
১০। হিন্দু সমাজের বাস্তব চিত্র কী?.....	57
১১। হিন্দুরা কি কার্যতই গরুকে পবিত্র মনে করেন?	64
১২। কিন্তু হিন্দুধর্মে প্রচুর পরিমাণে অবাধ্যতা পরিহার করা এবং পাপ থেকে দূরে থাকার প্রচেষ্টা রয়েছে, এটি কি একটি প্রার্থক্য নির্ধারণকারী বৈশিষ্ট্য নয়?.....	67
১৩। কিন্তু হিন্দুধর্মে থাকা সম্পূর্ণ চুপ থাকা এবং ধ্যানের উপবেশন এ সবকি ভাল জিনিস?.....	69
১৪। বর্তমান হিন্দুধর্মে যেমনটি রয়েছে, নির্জন প্রান্তরে জন বিচ্ছিন্ন হওয়া তাতে সমস্যা কী?.....	73

১৫। লালসা প্রতিরোধ এবং পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় কী?.....	76
১৬। ইসলাম কেন হিন্দুধর্মকে নাকচ করে?.....	80
১৭। প্রতিটি হিন্দু ব্যক্তির কেন ইসলামকে গ্রহণ করা উচিত?	88
১৮। ইসলাম কী?	106
১৯। এমন সব প্রশ্নের জবাব ইসলামে রয়েছে, যার উত্তর দিতে জ্ঞান-বুদ্ধি হয়রান হয়ে যায়? যেমন: আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা এ পৃথিবীতে কেন এসেছি? আর আমরা কোথায় প্রত্যাবর্তন করব?	110
২০। কীভাবে জানলাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা রাসূল?	112
২১। আল্লাহর উপরে ঈমান এনে (বিশ্বাস করে) নবীদেরকে অবিশ্বাস করা কী যথেষ্ট হবে, কতিপয় হিন্দুরা যেমন করে?	131
২২। আল্লাহ তা'আলা কেন মন্দ বা অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন? অথবা অন্য কথায়: একজন মুসলিম কীভাবে 'মন্দের জটিলতা' থেকে রক্ষা করবে?.....	135
২৩। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আত্ম-সমর্পনের স্বরূপ কী? অথবা অন্য কথায়: কীভাবে তুমি বুঝতে পারবে যে, তুমি আল্লাহর জন্য একজন মুসলিম-অনুগত ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতি পূর্ণাঙ্গ একজন আত্মসমর্পণকারী?	139
সবশেষে, আমি কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করব?	147